



কানার বেংলুশন

ভূ-রাজনীতি
ও রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙার
কৌশল

COLOR REVOLUTION

কালার রেভল্যুশন

ভূ-রাজনীতি ও রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙার কৌশল



কালার রেভল্যুশন

ভূ-রাজনীতি ও রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙার কৌশল

প্রকাশক: বেঙ্গল প্রিন্টস (Bengal Prints)

bengalprints.com

প্রকাশকাল: ২০২৬

পাবলিক ডোমেইন (CC0 1.0)

অবাধে পড়া, অনুলিপি ও বিতরণ করা যাবে

সূচিপত্র

প্রাক্কথন	৬
-----------------	---

প্রথম অধ্যায়

কালার রেভল্যুশনের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	৮
এক-মেরু বিশ্বব্যবস্থা বনাম রাশিয়া-চীন বলয়	৯
রাশিয়াকে ঘিরে বেটনী ও সাইবেরিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ	১১
চীনের বাণিজ্যপথ সংকুচিত করা ও 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগ প্রতিরোধ	১৪
ক্ষুদ্র ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর ভূ-রাজনৈতিক দাবার ঘাঁটিতে পরিণত হওয়া ..	১৮
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল বনাম ইরান দ্বন্দ্ব: মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার নতুন অধ্যায়	১৯
কালার রেভল্যুশন বনাম স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান: পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সাইবার পরিসরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কৌশল ...	২৬
অ্যালগরিদম ও বার্তা প্রচারের আধিপত্য	২৭
স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট (Bot), ট্রোল নেটওয়ার্ক ও কৃত্রিম জনমত	২৮
তথ্যবলয় (Filter Bubble) ও সামাজিক মেরুকরণ	২৮
সাইবার সমন্বয় ও আকস্মিক গণজমায়েত (Flash Mob)	২৯
প্ল্যাটফর্মভিত্তিক পার্থক্য ও রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া	৩০
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপফেক: তথ্য কারসাজির নতুন মাত্রা	৩০
সমন্বিত ডিজিটাল অভিযানের প্রায়োগিক চিত্র	৩২

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সমাজ	৩৩
জিন শাপের তত্ত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু করার কারণ	৩৪
আন্তর্জাতিক অনুদান, ফেলোশিপ ও 'স্মার্ট পাওয়ার'-এর প্রভাব	৩৬
সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল: অটপোর, খমারা, পোরা ও অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকা ...	৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

জনমনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও আবেগের ব্যবহার	৪১
তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও গণচেতনা পরিবর্তন	৪২
জনমনে আবেগ সৃষ্টির কৌশল ও চরিত্র নির্মাণ	৪৩
প্রতীক, সাংস্কৃতিক উপাদান ও ভীতি দূরীকরণের কৌশল	৪৪
মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ঐতিহাসিক শিকড়	৪৫
দলগত মেরুকরণ ও জনতার মনস্তত্ত্ব: ব্যক্তি কীভাবে সমষ্টির অংশ হয়ে ওঠে	৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

গোপন অভিযান ও ছদ্মবেশী সহিংসতা	৪৭
আহিংস আন্দোলনের আড়ালে পেশাদার সহিংসতা	৪৮
ইউক্রেনের রাজনৈতিক পটভূমি ও ২০০৪ সালের ‘কমলা বিপ্লব’	৪৯
ইউক্রেনের ময়দান স্নাইপার হামলা ও ড. ইভান কাচানোভস্কির গবেষণা	৫১
‘ব্লিডিং দ্য স্টেট’: নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল ভাঙার কৌশল	৫৩
২০২২-পরবর্তী যুদ্ধ ও ইউক্রেনের রাজনৈতিক বাস্তবতা: একটি কেস স্টাডির উপসংহার ...	৫৪
কালার রেভল্যুশন-পরবর্তী অস্থিরতা: ঐতিহ্য ধ্বংস ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ...	৫৬
কিরগিজস্তান: টিউলিপ বিপ্লব ও দ্বিতীয় দফার রক্তপাত	৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কৌশল	৬২
কালার রেভল্যুশনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও পরিণতি	৬৩
ক্ষুদ্র ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কৌশল	৬৩
তুলনামূলক বিশ্লেষণ: সাফল্য, ব্যর্থতা ও পরিণতি	৬৬
কালার রেভল্যুশন: সতর্কবার্তা, অনিবার্য পরিণতি নয়	৬৭

গ্রন্থপঞ্জি	৬৯
-------------------	----

প্রাক্কথন

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনায় ‘কালার রেভল্যুশন’ শব্দবন্ধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ এর প্রকৃত অর্থ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কৌশলগত কাঠামো নিয়ে বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য, তথ্যভিত্তিক ও পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণাধর্মী গ্রন্থ আমাদের চোখে পড়েনি। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ধারণার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের অভাব অনুভব করেছি। সেই শূন্যতা পূরণের তাগিদ থেকেই এই বই রচনার উদ্যোগ।

এই বই কোনো অনুবাদগ্রন্থ নয়; বরং দুটি ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী গবেষণাধারার তথ্য ও যুক্তি পর্যালোচনা, তুলনা ও যাচাই করে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। কালার রেভল্যুশনের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় রাশিয়ান ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক ওলেগ কারপোভিচ এবং মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আন্দ্রেই মানোইলোর *Color Revolutions: Techniques in Breaking Down Modern Political Regimes* (২০১৫) গ্রন্থে। তাঁরা কালার রেভল্যুশনকে পশ্চিমা স্বার্থে পরিচালিত একটি সুপারিকল্পিত ভূ-রাজনৈতিক কৌশল বা ‘তথ্য-মনস্তাত্ত্বিক প্রযুক্তি’ (Information-Psychological Technology) হিসেবে দেখেছেন, যার উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাকাঠামো ভেঙে দেওয়া। এর বিপরীতে, কালার রেভল্যুশনের ভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিংকন এ. মিচেলের *The Color Revolutions* (২০১২) গ্রন্থে। মূলধারার পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই বইয়ে মিচেল কালার রেভল্যুশনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে বহিঃশক্তির সুপারিকল্পিত

কৌশলের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যকার বিভাজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই দুই ঘরানার মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে, বিশেষত কালার রেভল্যুশনে বহিঃশক্তির ভূমিকা কতটা মুখ্য তা নিয়ে। এই বইয়ে সেই মতপার্থক্য আড়াল করা হয়নি। বরং উভয় ধারার তথ্য ও যুক্তি যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে এক ধারার তথ্যের ভিত্তিতে অন্য ধারার সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করা হয়েছে। এর বিস্তারিত উদাহরণ রয়েছে প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায়ে।

এই যাচাই ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বইটিতে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে: কালার রেভল্যুশন একটি প্রকৃত ভূ-রাজনৈতিক হুমকি, তবে তা কার্যকর হয় তখনই, যখন লক্ষ্যরাষ্ট্রে আগে থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে। এই দুর্বলতা বহিঃশক্তির জন্য সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ও সংগঠনে বহিঃশক্তিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বইটি মোট ছয় অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে কালার রেভল্যুশনের ভূ-রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচনার পর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে এর কারিগরি ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইউক্রেন ও কিরগিজস্তানকে বিস্তারিত কেস স্টাডি হিসেবে উপস্থাপন করে ২০০৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দেশ দুটির রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পার্থক্য বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ধারাটিও বুঝতে পারবেন। শেষ অধ্যায়ে বইয়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাস্তবসম্মত প্রতিরোধ ও সুরক্ষাকৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

কালার রেভল্যুশনের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

এক-মেরু বিশ্বব্যবস্থা বনাম রাশিয়া-চীন বলয়

একুশ শতকের আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য ও প্রভাব বিস্তারের একটি জটিল অধ্যায়। ১৯৯১ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে এক-মেরু বিশ্বব্যবস্থার সূচনা হয়। তবে পরবর্তী দুই দশকে ইউরেশীয় অঞ্চলে রাশিয়া ও চীনের পুনরুত্থান এই একক আধিপত্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

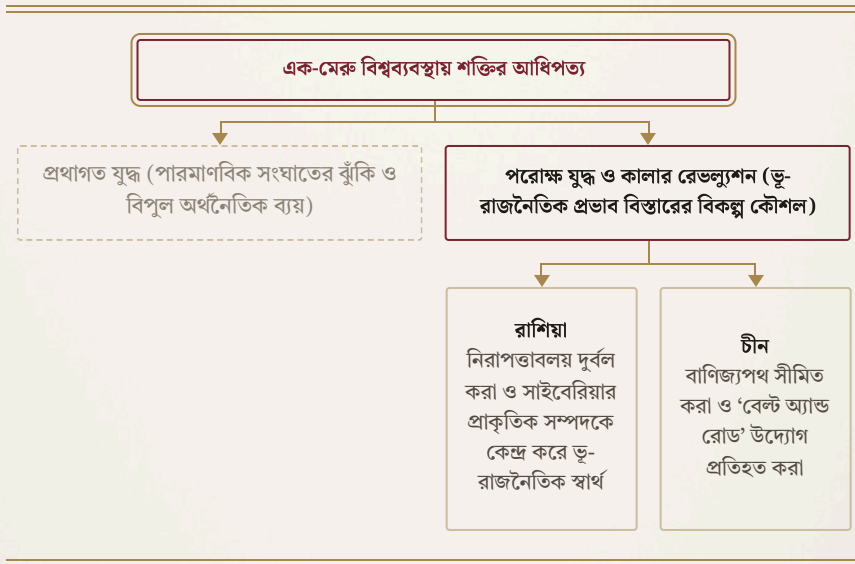
ওলেগ কারপোভিচ ও আন্দ্রেই মানোইলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পারমাণবিক যুগে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়ানো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। ফলে পরাশক্তিগুলো সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে ‘হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার’ (Hybrid Warfare) বা ‘বহুমাত্রিক রণকৌশলের’ আশ্রয় নিচ্ছে। এই রণকৌশলের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ‘কালার রেভল্যুশন’, যেখানে কোনো সামরিক আক্রমণ ছাড়াই একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে সরকার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

হাইব্রিড ওয়ারফেয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এতে যুদ্ধ শুরুর কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্ত থাকে না। প্রথাগত যুদ্ধের একটি স্পষ্ট সূচনা ও সমাপ্তি থাকে। কিন্তু বহুমাত্রিক সংঘাতে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, অপপ্রচার ও তথ্যযুদ্ধ, সাইবার আক্রমণ, প্রক্সি বাহিনীর মাধ্যমে সহিংসতা এবং কূটনৈতিক চাপ—এসব কৌশল একযোগে ও ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। এর অনেক কিছুই পরিচালিত হয় আইনি ধূসর অঞ্চলে (Legal Grey Zone)।

এই অস্পষ্টতার কারণে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ কোনো একক ঘটনাকেই সহজে ‘যুদ্ধের কারণ’ (Casus Belli) হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। মার্কিন সামরিক তাত্ত্বিকেরা এ ধরনের কৌশলকে ‘সীমার নিচের সংঘাত’ (Below-the-Threshold Conflict) নামে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ এমন মাত্রার আগ্রাসন, যা সরাসরি সামরিক প্রতিক্রিয়া উসকে দেওয়ার সীমা অতিক্রম করে না, অথচ দীর্ঘমেয়াদে লক্ষ্যরাষ্ট্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দিতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কারপোভিচ ও মানোইলো বলেন, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের ধরনই বদলে গেছে। জোসেফ নাইয়ের বিশ্লেষণে ‘হার্ড পাওয়ার’ বলতে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে চাপ প্রয়োগের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। এর বিপরীতে ‘সফট পাওয়ার’ হলো সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। আধুনিক বিশ্বে সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগের তুলনায় এ ধরনের প্রভাব বিস্তার অনেক ক্ষেত্রে কম ব্যয়বহুল ও কার্যকর।

কালার রেভল্যুশন মূলত এই হার্ড ও সফট পাওয়ারের একটি সমন্বিত রূপ, যাকে তাঁরা ‘স্মার্ট পাওয়ার’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এতে প্রথমে সফট পাওয়ারের বিভিন্ন উপায়ে একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে প্রভাবিত ও সংগঠিত করা হয়। এরপর প্রয়োজনে সীমিত বলপ্রয়োগ বা গোপন অভিযানের মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়।



কারপোভিচ ও মানোইলো তাঁদের গ্রন্থে ‘নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা’ (Controlled Chaos) নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে,

কোনো অঞ্চল সরাসরি দখল না করেও সেখানে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির— যেমন রাশিয়া বা চীন— মনোযোগ ও সম্পদ সেই অঞ্চলেই আটকে রাখা যায়। ফলে বৈশ্বিক পরিসরে অন্যত্র তাদের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খলা কোনো দুর্ঘটনা নয়; বরং এটি সুপরিচালিতভাবে পরিচালিত হয়। সেই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলা কিংবা পূর্ণ স্থিতিশীলতা— কোনোটিই পরিকল্পনাকারীদের কাম্য নয়। কারণ দুই ক্ষেত্রেই বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ কমে যায়। তাই লক্ষ্য থাকে একধরনের ‘পরিচালনাযোগ্য অস্থিতিশীলতা’ বজায় রাখা, যা দীর্ঘ সময় ধরে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে দুর্বল ও নির্ভরশীল করে রাখতে পারে।

রাশিয়াকে ঘিরে বেষ্টনী ও সাইবেরিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ

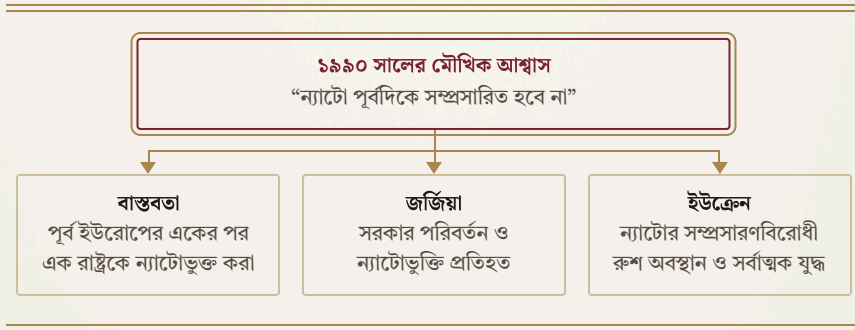
ব্রিটিশ ভূ-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ স্যার হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের ‘হাটল্যান্ড থিওরি’ (Heartland Theory) অনুযায়ী, ইউরেশিয়ার কেন্দ্রস্থল যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে, বিশ্বরাজনীতিতে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। আর ইউরেশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক শক্তিসমীকরণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাশিয়া— দেশটির বিশাল ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও কৌশলগত অবস্থানের কারণে। ইউরেশিয়ায় রাশিয়ার সীমান্তসংলগ্ন প্রাক্তন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলো, যেমন ইউক্রেন, জর্জিয়া, বেলারুশ ও কিরগিজস্তান, দেশটির কৌশলগত নিরাপত্তাবলয় (Buffer Zone) হিসেবে কাজ করে। কালার রেভল্যুশনের মাধ্যমে এসব দেশে পশ্চিমাপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা রাশিয়ার নিরাপত্তাকে সরাসরি হুমকির মুখে ফেলে।

রাশিয়াকেন্দ্রিক ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাইবেরিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদকে ঘিরে অর্থনৈতিক স্বার্থ। ইউরাল পর্বতমালার পূর্বে বিস্তৃত সাইবেরিয়া বিশ্বের অন্যতম সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চল; সেখানে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা, হীরা এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খনিজের বিপুল মজুত রয়েছে। রাশিয়াকে যদি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার মাধ্যমে খণ্ডিত বা দুর্বল করা যায়, তবে বিদেশি শক্তি ও আন্তর্জাতিক

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সাইবেরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হতে পারে।

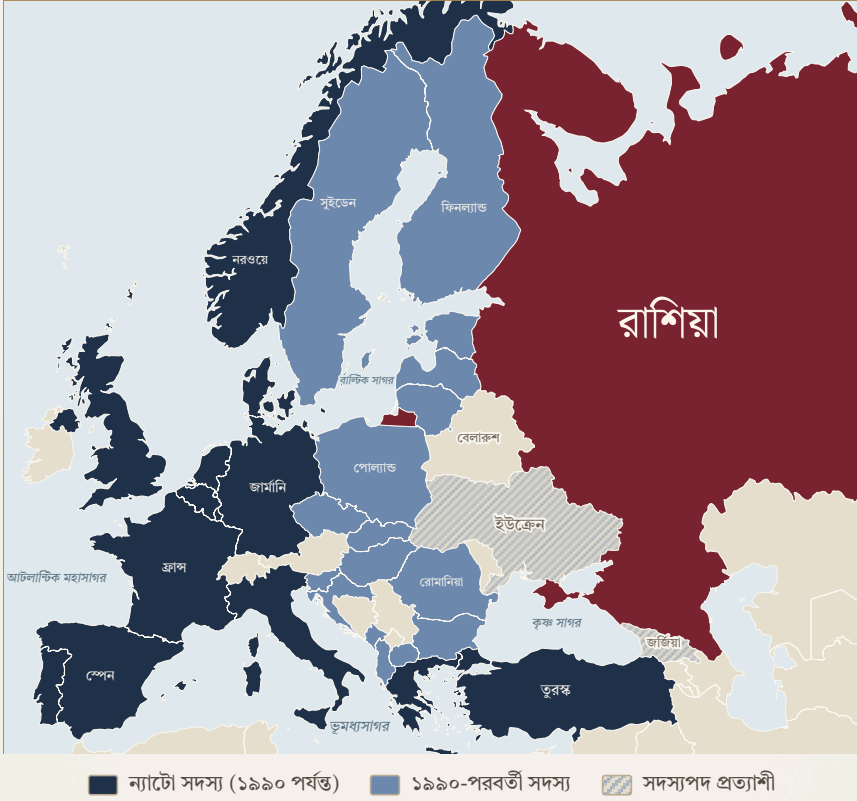
এই ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে রুশ দার্শনিক ও ভূ-রাজনৈতিক তাত্ত্বিক আলেক্সান্ডার দুগিন দীর্ঘদিন ধরে একটি সভ্যতাগত সংঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা করে আসছেন: প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্যের এক ধ্রুপদি দ্বন্দ্ব, যেখানে একদিকে রয়েছে রাশিয়া-চীন বলয়, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপীয় জোট। তাঁর মতে, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলেও এই দ্বন্দ্বের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে; বদলেছে কেবল যুদ্ধের ধরন।

১৯৯০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একীভূতকরণের সময় পশ্চিমা নেতারা সোভিয়েত নেতৃত্বকে মৌখিকভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে ন্যাটোর সামরিক উপস্থিতি জার্মানির আরও পূর্বদিকে, অর্থাৎ রাশিয়ার সীমান্তের দিকে সম্প্রসারিত হবে না। কিন্তু পরবর্তী তিন দশকে পূর্ব ইউরোপের একের পর এক রাষ্ট্রকে ন্যাটোভুক্ত করা হয় এবং জোটটির ভৌগোলিক পরিসর ক্রমশ রাশিয়ার সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায়। নিচের মানচিত্রে ন্যাটোর এই পূর্বমুখী সম্প্রসারণের ধারা তুলে ধরা হয়েছে।



এই ধারাবাহিকতায় ন্যাটোর জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন ও জর্জিয়া—যে দুটি রাষ্ট্র রাশিয়ার নিরাপত্তাবলয়ের শেষ প্রতিরক্ষা-প্রাচীর। তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী ছোট রাষ্ট্র জর্জিয়ার ক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তন ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ন্যাটোভুক্তির প্রচেষ্টা প্রতিহত করে রাশিয়া। তবে ইউক্রেনের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান না আসায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সর্বাঙ্গিক সামরিক সংঘাতে রূপ নেয়। কিছু বিশ্লেষকের মতে, এই যুদ্ধ কেবল আঞ্চলিক

নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়; এর বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। রাশিয়াকে দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল সংঘাতে জড়িয়ে রাখাও এই বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ।



চিত্র ১.১ সময়ের সাথে সাথে ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাশিয়ার সীমান্তের দিকে সম্প্রসারণ

সাইবেরিয়ার খনিজ সম্পদ কেবল তেল, গ্যাস ও মূল্যবান ধাতুতেই সীমাবদ্ধ নয়; আধুনিক প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিরল মৃত্তিকা মৌলের (Rare Earth Elements) উল্লেখযোগ্য মজুতও সেখানে রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৯০-এর দশক থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট আখ্যান প্রচার করা হচ্ছে: সাইবেরিয়ার এই বিপুল সম্পদভাণ্ডার কেবল

রাশিয়ার একক সম্পত্তি নয়, বরং তা মানবজাতির 'বৈশ্বিক সম্পদ' (Global Resource)। অথচ নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাদের একই যুক্তি প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। বিশ্লেষকদের মতে, এই আখ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো সাইবেরিয়ার খনিজ সম্পদের ওপর মার্কিন ও ইউরোপীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর পরের ঘটনাপ্রবাহে এই কৌশলের বাস্তব প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেখা যায়। ন্যাটোতে ইউক্রেনের সম্ভাব্য অন্তর্ভুক্তি নিয়ে রাশিয়া ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিনের ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক আক্রমণের পর ইউক্রেনের খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের নতুন সুযোগ তৈরি হয়। ২০২৫ সালের ৩০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত খনিজ সম্পদসংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী, নতুন খনিজ, তেল ও গ্যাস প্রকল্প থেকে ইউক্রেন সরকারের প্রাপ্য নির্দিষ্ট আয়ের ৫০ শতাংশ একটি যৌথ মার্কিন-ইউক্রেনীয় বিনিয়োগ তহবিলে জমা দেওয়ার বিধান রাখা হয়। এর মাধ্যমে ইউক্রেনের প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের একটি কাঠামো গড়ে ওঠে। একইভাবে, সুদূরপ্রাচ্যের মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও দেশটির কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি বিপুল খনিজ সম্পদ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ বিষয়ে পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চীনের বাণিজ্যপথ সংকুচিত করা ও 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' উদ্যোগ প্রতিরোধ

চীনের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিস্তার ঠেকানোও কালার রেভল্যুশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য। চীন তার 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের নতুন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। যেসব রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে চীনের প্রধান বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহনপথ অতিক্রম করেছে, সেসব রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করা গেলে চীনের বাণিজ্যপ্রবাহ ও সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হবে। বিশেষ করে মালাকা প্রণালী ও ভারত

মহাসাগরসংলগ্ন ছোট অথচ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোতে অস্থিতিশীলতা বজায় রাখা এই কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চীনকে ঘিরে একটি বিস্তৃত সামরিক বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। জাপান, গুয়াম, তাইওয়ান প্রণালী, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত এই সামরিক নেটওয়ার্ক চীনের কৌশলগত প্রভাব সীমিত রাখার একটি সুসংহত ‘কনটেইনমেন্ট’ (Containment) কৌশলের অংশ। নিচের মানচিত্রে এই সামরিক বলয়ের বিস্তার তুলে ধরা হয়েছে।

এই সামরিক বলয়ের মূল লক্ষ্য চীনকে তার নিজস্ব উপকূলীয় জলসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা, যাতে প্রয়োজনে ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ উদ্যোগের সমুদ্রপথ ও কৌশলগত জ্বালানি সরবরাহ পথগুলো অবরুদ্ধ করা সম্ভব হয়। এই বলয়কে চীনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের ভূ-কৌশলগত অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারে প্রভাব বিস্তার করা গেলে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরসংলগ্ন অঞ্চলে নতুন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে মালাক্কা প্রণালীর বিকল্প হিসেবে চীনের গড়ে তোলা জ্বালানি সরবরাহ করিডোরটিও প্রয়োজনে ব্যাহত করা সম্ভব হবে।

বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, মিয়ানমারে প্রভাব বিস্তারের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রতিবেশী বাংলাদেশে একটি পশ্চিমাংশী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এ অঞ্চলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোকে কেবল অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসেবে না দেখে বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে এটি একটি নির্দিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, যা নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

একই ধরনের কৌশলগত হিসাব-নিকাশ মধ্যপ্রাচ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ অঞ্চলে সিরিয়া ও ইরান দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া-চীন অক্ষের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। রাশিয়া ও ইরানের প্রত্যক্ষ সামরিক সহায়তায় সিরিয়ার আসাদ সরকার আরব বসন্ত-পরবর্তী অস্থিরতা দীর্ঘদিন মোকাবিলা করে ক্ষমতায় টিকে ছিল। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; একই সময়ে সিরিয়ার প্রতিবেশী

লেবাননে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীর অগ্রযাত্রার মুখে আসাদ সরকারের পতন ঘটে। এর পরপরই এ অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে ওঠে বলে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক মনে করেন।

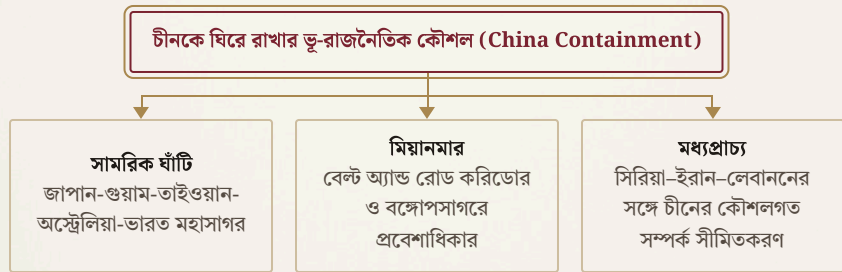


★ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি / উপস্থিতি ○ কৌশলগত অংশীদার --- প্রথম দ্বীপশৃঙ্খল

চিত্র ১.২ চীনের চারপাশে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদেশগুলোর সামরিক উপস্থিতি ও ঘাঁটি বিন্যাস।

সিরিয়ার এই রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে কারপোভিচ এবং মানোইলো তাঁদের মূল বইয়ে ‘কালার রেভল্যুশনের সিরীয় সংস্করণ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এ বিষয়ে একটি পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সিরিয়ার ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে কালার রেভল্যুশন সবসময় সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয় না। ২০১১ সালে আরব বসন্তের ঢেউয়ে সিরিয়াতেও প্রথমে শান্তিপূর্ণ

সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা প্রাথমিক পর্যায়ে অন্যান্য আরব দেশের অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু সিরীয় রাষ্ট্রযন্ত্র ও নিরাপত্তা বাহিনী তুলনামূলকভাবে সুসংহত থাকায় আন্দোলনটি প্রত্যাশিত দ্রুততায় সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ও ইরানের সামরিক সমর্থন আসাদ সরকারের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে। এর মধ্যে সংঘাতের প্রকৃতি ধীরে ধীরে বদলে যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়, যেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি নিজ নিজ সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সহায়তা জুগিয়ে যায়। এই দীর্ঘায়িত সংঘাত একটি কৌশলগত উদ্দেশ্যও পূরণ করে: রাশিয়া ও ইরানকে বছরের পর বছর ব্যয়বহুল সংঘাতে জড়িয়ে রেখে তাদের বিপুল অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে বাধ্য করা এবং অন্যত্র তাদের কৌশলগত সক্ষমতা সীমিত করা।



বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, গত দুই দশকে পূর্ব ইউরোপ থেকে আরব বিশ্ব ও এশিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে কালার রেভল্যুশনের অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এসব প্রচেষ্টা সব ক্ষেত্রে সফল হয়নি। রাশিয়ার ‘হোয়াইট রিবন রেভল্যুশন’ এবং হংকংয়ের ‘আন্দোলন রেভল্যুশন’ এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যেখানে আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসব প্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কালার রেভল্যুশনের লক্ষ্য অর্জন কিছু নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শর্তের ওপর নির্ভর করে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এসব শর্ত ও তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যেও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনযন্ত্র তুলনামূলকভাবে সংহত ছিল এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামোও যথেষ্ট স্থিতিশীল ছিল। বিপরীতে, যেসব রাষ্ট্রে আগে থেকেই গভীর অর্থনৈতিক সংকট, সামরিক ও বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা কিংবা রাজনৈতিক মেরুত্ববিহীনতা বিদ্যমান ছিল, সেখানে বহিঃশক্তির প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। এই পর্যবেক্ষণ বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সংগঠন ও জনমনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তারের আলোচনায়, বারবার উঠে এসেছে।

ক্ষুদ্র ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর ভূ-রাজনৈতিক দাবার ঘাঁটিতে পরিণত হওয়া

পরশক্তিগুলোর ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো, যারা আন্তর্জাতিক দাবার চালে ঘাঁটি (Pawn) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব রাষ্ট্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সরাসরি সামরিক হামলা চালানোর প্রয়োজন হয় না। বরং নাগরিক সমাজ, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন কিংবা নির্বাচনের স্বচ্ছতার মতো সর্বজনগ্রাহ্য দাবিগুলোকে সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা তৈরি করে অতি সহজে সরকার পতন ঘটানো সম্ভব হয়।

এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাধারণত দুই বা ততোধিক পরশক্তির প্রভাববলয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ভূ-রাজনীতিতে এ ধরনের অঞ্চলকে প্রায়ই ‘শ্যাটারবেল্ট’ (Shatterbelt) বলা হয়। জর্জিয়া, ইউক্রেন, কিরগিজস্তান, সিরিয়া, লেবানন কিংবা মিয়ানমারের মতো দেশগুলো এই শ্রেণিতে পড়ে। এসব দেশে সাধারণত আগে থেকেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন বিদ্যমান থাকে; জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ থাকে, যা বহিঃশক্তির প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করে। কালার রেভল্যুশনের পরিকল্পনাকারীরা সাধারণত নতুন করে বিভাজন সৃষ্টি করে না; বরং সমাজে আগে থেকেই বিদ্যমান ফাটলগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোকে আরও গভীর করে তোলে।

একটি রাষ্ট্রের ‘পন রাষ্ট্র’ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সাধারণত তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্যায় হলো ‘ম্যাপিং’। এ পর্যায়ে লক্ষ্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে কোন কোন সামাজিক শ্রেণি, অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার প্রতি সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট, তা চিহ্নিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো ‘নেটওয়ার্ক নির্মাণ’। এ পর্যায়ে চিহ্নিত অসন্তুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব খুঁজে বের করে তাদের সংগঠিত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা হয়। তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায় হলো ‘ট্রিগার ইভেন্ট’- এমন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা, যা আগে থেকেই প্রস্তুত নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করে এবং ব্যাপক জনসমর্থন সংগঠিত করতে ব্যবহৃত হয়। একটি বিতর্কিত নির্বাচন, দুর্নীতির কেলেঙ্কারি কিংবা পুলিশি নিপীড়নের ঘটনা এ ধরনের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে। এই তিন পর্যায়ের কাঠামোর প্রতিফলন বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত বিভিন্ন কালার রেভল্যুশনের ঘটনাপ্রবাহে কমবেশি লক্ষ করা যায়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন- ‘পন রাষ্ট্র’ মানেই সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্র নয়। বরং এটি এমন একটি অবস্থা বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত একাধিক বহিঃশক্তির প্রতিযোগী স্বার্থের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তবে এই প্রভাব সবসময় প্রত্যক্ষ সামরিক বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আসে না। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, ঋণের কাঠামো, বাণিজ্য চুক্তি কিংবা প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই প্রভাব বিস্তার করা হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংশ বলে মনে হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল বনাম ইরান দ্বন্দ্ব: মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিশীলতার নতুন অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্যের এই ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল ও ইরানের প্রত্যক্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পেয়েছে। ২০১৫ সালে মূল বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় সিরিয়া ছিল এই প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু; পরবর্তী দশকে একই ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ইরানকে ঘিরে আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

২০২৫ সালের ১৩ জুন ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনাগুলোতে ব্যাপক বিমান হামলা চালায়, যা পরবর্তীতে বারো দিনব্যাপী সরাসরি যুদ্ধে রূপ নেয়। এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রও সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। ২২ জুন মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায়— ফোরদো, নাতাজ্জ ও ইসফাহান— হামলা চালায়। এসব স্থাপনার মধ্যে কয়েকটি ভূগর্ভের গভীরে অবস্থিত এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ায় সেখানে কার্যকর হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষায়িত সামরিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। ইরানও পাল্টা হামলা চালায়; ইসরাইলের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র রাষ্ট্রগুলোতে— বাহরাইন, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরাক— ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলা পরিচালিত হয়। ১৩ জুন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয় এবং এই সংঘাতকে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ‘বারো দিনের যুদ্ধ’ (12-Day War) নামে অভিহিত করেন।

তবে এই যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হয়নি। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইরানজুড়ে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়, যা তেহরানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গভীর জনরোষের প্রতিফলন। এই বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করা হলেও, এর অব্যবহিত পরই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু করে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযান আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও ব্যাপক ও তীব্র ছিল। দ্বিতীয় দফার এই সামরিক অভিযানের সময়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর ঠিক আগে জেনেভায় ওমানের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটন ও তেহরানের উচ্চপর্যায়ের পারমাণবিক আলোচনা কোনো সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়।

কারপোভিচ ও মানোইলোর তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে দেখলে, ইরানের এই ঘটনাপ্রবাহে কালার রেভল্যুশন কৌশলের একটি বিশেষ রূপ লক্ষ করা যায়, যেখানে অভ্যন্তরীণ গণঅসন্তোষের সঙ্গে বহিঃস্থ সামরিক চাপের সমন্বয় ঘটানো হয়। প্রথমে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও তথ্যপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে শাসনব্যবস্থার প্রতি জনরোষ তীব্র করা হয়। এরপর সেই ক্ষোভ রাজপথের বিক্ষোভে রূপ নিলে তাকে সামনে রেখে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে একটি নৈতিক যুক্তি দাঁড় করানোর সুযোগ তৈরি হয়। ভেতর থেকে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং বাইরে থেকে সামরিক চাপ প্রয়োগ— এই দ্বৈত কৌশল বইয়ের মূল যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক

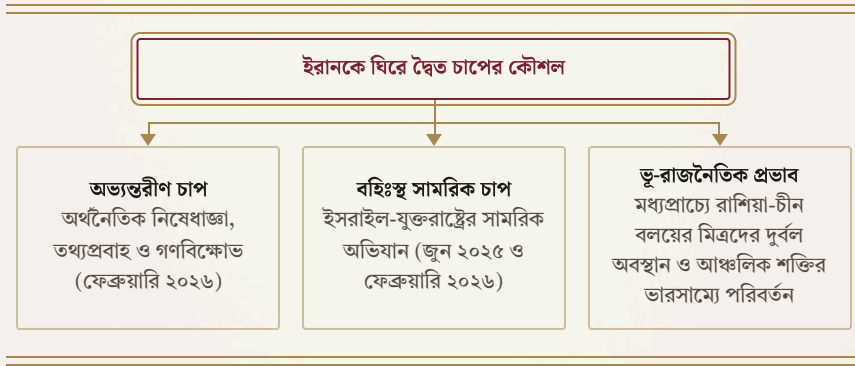
শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করা বা ভেঙে দেওয়ার জন্য কোনো একক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয় না; বরং তথ্য-মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ও সামরিক শক্তির সমন্বিত প্রয়োগই হয়ে উঠেছে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন বাস্তবতা।

এই সংঘাতও অধ্যায়ের শুরুতে আলোচিত রাশিয়া ও চীনের প্রভাব সীমিত করার বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইরান দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া-চীন বলয়ের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মিত্র এবং জ্বালানি করিডোরের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইরানকে দুর্বল বা অস্থিতিশীল রাখা গেলে তার প্রভাব কেবল ইসরাইলের আঞ্চলিক নিরাপত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়া-চীন বলয়ের অবস্থানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগে সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়েও এই বলয়কে দুর্বল করার একই কৌশলের প্রতিফলন দেখা গেছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা ও মনোযোগ আগে থেকেই বিভক্ত; এমতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে একই ধরনের সংকট তৈরি হলে আঞ্চলিক মিত্রদের কার্যকর সহায়তা দেওয়া রাশিয়ার জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়ে। কারপোভিচ ও মানোইলোর তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরিস্থিতিকে ‘নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা’ ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এই আলোচনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে আসে: কালার রেভল্যুশন সবসময় সম্পূর্ণ অহিংস থাকে না। সিরিয়া ও ইরানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য-মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক আন্দোলনভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ করা হলেও, শাসনব্যবস্থা পর্যাপ্ত সংহত থাকলে পরবর্তী ধাপে সরাসরি সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত ‘অহিংস’ কালার রেভল্যুশন মডেল—যেমন সার্বিয়া বা জর্জিয়ার ঘটনা—থেকে কিছুটা ভিন্ন। তবে মূল লক্ষ্য একই থাকে: প্রতিপক্ষ শক্তির আঞ্চলিক মিত্রবলয় দুর্বল করা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করা।

ইরান-ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতের এই ধারাবাহিকতা থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে আসে। আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে ‘সম্পূর্ণ যুদ্ধ’ ও ‘সম্পূর্ণ শান্তি’র মধ্যবর্তী একধরনের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যাকে কিছু

বিশ্লেষক ‘স্থায়ী সংকট’ (Permanent Crisis) নামে অভিহিত করেন। এই পরিস্থিতিতে সংঘাত কখনো পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়, আবার কখনো সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে আসে; কিন্তু অন্তর্নিহিত উত্তেজনা পুরোপুরি দূর হয় না। এই দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তা নিজেই একটি কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, কারণ এটি প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রকে ক্রমাগত প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে বাধ্য করে এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।



কালার রেভল্যুশন বনাম স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান: পার্থক্য নির্ণয়ের মানদণ্ড

এই বইয়ের আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। কালার রেভল্যুশন এবং কোনো দেশের প্রকৃত ও স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে নির্ণয় করা যায়? এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি; তা না হলে বইয়ে উপস্থাপিত বিশ্লেষণী কাঠামো ভুলভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সেক্ষেত্রে যেকোনো গণআন্দোলনকেই ঢালাওভাবে ‘বিদেশি ষড়যন্ত্র’ বলে আখ্যায়িত করা হতে পারে, যা এই বিশ্লেষণী কাঠামোর যথাযথ প্রয়োগ নয়, বরং তার অপব্যবহার।

কালার রেভল্যুশন ও স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানকে আলাদা করে চেনার ক্ষেত্রে প্রধান জটিলতা হলো, আধুনিক গণআন্দোলনগুলোর বাহ্যিক রূপে অনেক মিল রয়েছে। বিদেশি মদদ থাকুক বা না থাকুক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার, তরুণ ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, নির্দিষ্ট রঙ, প্রতীক বা স্লোগানের ব্যবহার

এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ- এসব এখন প্রায় সব বড় আন্দোলনেই দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এতটাই সর্বজনীন হয়ে উঠেছে যে, শুধু এগুলোর উপস্থিতির ভিত্তিতে কোনো আন্দোলনের উৎস বা প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন।

কারপোভিচ ও মানোইলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, কোনো আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে হলে তার দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের চেয়ে তার উৎস, উদ্দেশ্য এবং চূড়ান্ত সুবিধাভোগী কারা, সেদিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। তাঁদের মতে, কালার রেভল্যুশন হলো পশ্চিমা- বিশেষ করে মার্কিন ও ইউরোপীয়- ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে পরিকল্পিত ও পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। এর মূল লক্ষ্য পশ্চিমা স্বার্থের প্রতিকূল বা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণকারী কোনো সরকারকে অপসারণ করে তার স্থলে পশ্চিমা স্বার্থের প্রতি অধিক অনুগত বা নমনীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আন্দোলনের পেছনে থাকা জনঅসন্তোষ মিথ্যা বা বানোয়াট। বরং কালার রেভল্যুশন প্রায়ই সমাজে বিদ্যমান কোনো বাস্তব ও ন্যায্য অভিযোগকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে- যেমন নির্বাচনী জালিয়াতি, দুর্নীতি বা স্বৈরাচারী দমননীতি। অর্থাৎ জনগণের ক্ষোভ বাস্তব হতে পারে; কিন্তু কালার রেভল্যুশনের মাধ্যমে সেই ক্ষোভকে একটি পূর্বনির্ধারিত ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বিপরীতে, একটি প্রকৃত স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয়। এর পেছনে শুরু থেকেই কোনো বহিঃশক্তির পূর্বনির্ধারিত ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকে না। আন্দোলনের দাবিগুলোও সাধারণত দেশের শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে; কোনো নির্দিষ্ট বহিঃশক্তির স্বার্থ বা ভূ-রাজনৈতিক অভিসন্ধির সঙ্গে সেই আন্দোলনের কোনো পূর্বনির্ধারিত যোগসূত্র থাকে না।

এই তাত্ত্বিক কাঠামো বাস্তবে প্রয়োগ করে কোনো আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। নিচে এমন কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য মানদণ্ড তুলে ধরা হলো, যেগুলো একত্রে বিচার করলে আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে কোনো একক মানদণ্ডের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে

পৌঁছানো উচিত নয়; বরং একাধিক মানদণ্ড একই দিকে ইঙ্গিত করলে আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব।

এই মানদণ্ডগুলো কেবল কারপোভিচ ও মানোইলোর তাত্ত্বিক দাবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিংকন মিচেলের ‘*The Color Revolutions*’ (2012) বইয়ে পর্যালোচিত পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাতেও একই ধরনের কিছু কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়। গবেষক লুকান ওয়ের মতে, কোনো শাসনব্যবস্থার পতনের পেছনে তার নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেনরি হেল দেখিয়েছেন, ক্ষমতাসীন নেতা যখন দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর বিদায় আসন্ন বলে মনে হতে থাকে, তখনই বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়। অন্যদিকে, পল দানিয়েরি আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্রে ছাত্র বা নাগরিক সমাজের ভূমিকার চেয়ে ক্ষমতাকাঠামোর প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও নিরাপত্তা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

এসব পর্যবেক্ষণ থেকে মিচেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, কালার রেভল্যুশন মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ কারণে সংঘটিত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন; এর পেছনে বহিঃশক্তির পরিকল্পনা মুখ্য নয়। এই বই মিচেলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। বরং তাঁর উপস্থাপিত তথ্য থেকেই ভিন্ন একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কালার রেভল্যুশনের সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ও সংগঠনে বহিঃশক্তির ভূমিকাই মুখ্য। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও নেতৃত্বের বৈধতার সংকটকে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের পূর্বশর্ত হিসেবেই দেখা যায়, বিকল্প ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনও পরবর্তী সময়ে বহিঃশক্তির দ্বারা ‘আত্মসাৎ’ (Co-opted) হতে পারে। আবার শুরুতে বহিঃশক্তির সমর্থনপুষ্ট কোনো আন্দোলনও সময়ের সঙ্গে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ আন্দোলনের চরিত্র সময়ের সঙ্গে বদলে যেতে পারে এবং বাস্তবে এই দুই অবস্থার মধ্যে সবসময় স্পষ্ট সীমারেখা থাকে না। তাই কোনো আন্দোলন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা জরুরি।

সারণি ১.১ কালার রেভল্যুশন ও স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের পার্থক্য নির্ণয়ের সহায়ক মানদণ্ড

মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রশ্ন
পূর্বপ্রস্তুতির সময়কাল	আন্দোলন শুরুর অনেক আগে থেকেই কি নির্দিষ্ট নেতৃত্ব, প্রতীক ও প্রশিক্ষিত কর্মীদল প্রস্তুত ছিল, নাকি সংকটের মধ্য দিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে?
অর্থায়নের উৎস	আন্দোলন পরিচালনাকারী সংগঠনগুলো কি আগে থেকেই কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পেয়ে আসছিল?
দাবির প্রকৃতি	আন্দোলনের মূল দাবিগুলো কি অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিকেন্দ্রিক, নাকি এর সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো বৈদেশিক জোটে যোগদান বা কোনো পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবিও যুক্ত রয়েছে?
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা	আন্দোলনের শুরু থেকেই কি প্রধান পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো অস্বাভাবিক দ্রুততায় এবং একই ধরনের ইতিবাচক বয়ানে আন্দোলনের পক্ষে প্রচার শুরু করেছিল?
ক্ষমতা পরিবর্তনের পরিণতি	ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন সরকার কি দ্রুত কোনো নির্দিষ্ট পরাশক্তির সঙ্গে সামরিক বা কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করেছে কিংবা নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে?

এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে, বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত ইউক্রেনের কেস স্টাডির মাধ্যমে, পূর্বে উল্লিখিত মানদণ্ডগুলো বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, তা বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

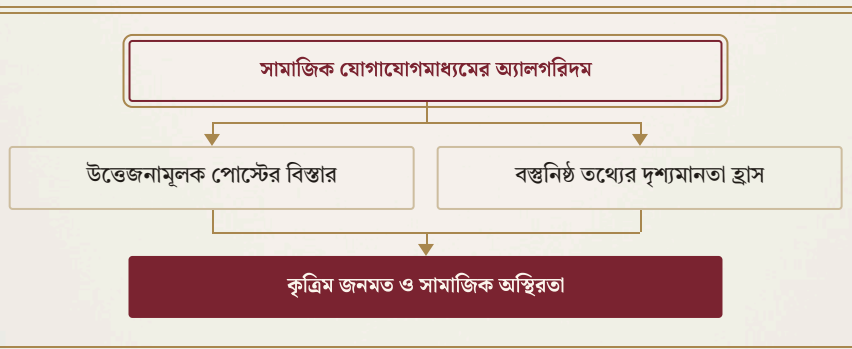
দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে
ও সাইবার পরিসরে
অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কৌশল

অ্যালগরিদম ও বার্তা প্রচারের আধিপত্য

ডি জিটাল যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা অনেক সময় রাজপথে নয়, বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘটে। ফেসবুক, এক্স (সাবেক টুইটার) ও টেলিগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে বিতর্কিত, ক্ষোভসৃষ্টিকারী বা আবেগঘন পোস্ট সাধারণ বিষয়বস্তুর তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার পেছনে প্ল্যাটফর্মগুলোর অ্যালগরিদম ও ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট কিছু বার্তা পরিকল্পিতভাবে বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরা যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনমত, ক্ষোভ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

অ্যালগরিদমভিত্তিক এই তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুবিধা রয়েছে। এখানে তথ্যের প্রচার ও বিস্তার প্রথাগত গণমাধ্যমের মতো কোনো একক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে প্রচলিত সেন্সরশিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর ব্যবসায়িক মডেলই এমন যে, ব্যবহারকারীদের যত বেশি সময় সম্ভব প্ল্যাটফর্মে ধরে রাখাই তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভয়, ক্ষোভ বা বিস্ময় জাগানো কনটেন্ট মানুষের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে বলে অ্যালগরিদমও এ ধরনের কনটেন্ট দ্রুত আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। কালার রেভলুশনের পরিকল্পনাকারীদের জন্য এই ব্যবস্থা একটি প্রস্তুত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে, যা তাদের বার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেয়।



স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট (Bot), ট্রোল নেটওয়ার্ক ও কৃত্রিম জনমত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করতে হাজার হাজার স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট (Social Bots) ও সংগঠিত ট্রোল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে কৃত্রিম জনসমর্থনের আবহ (Astroturfing) তৈরি করা হয়, যাতে সাধারণ মানুষের মনে হয়, সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষ বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই ধারণা অন্যদেরও একই অবস্থান নিতে বা আন্দোলনে যোগ দিতে প্রভাবিত করতে পারে।

এই কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তথাকথিত ‘বহুত্বের বিভ্রম’ (Illusion of Plurality) তৈরি করা। একজন মানুষ যখন দেখেন, শত শত অ্যাকাউন্ট থেকে একই মত প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে হতে পারে যে এটিই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মত। অথচ বাস্তবে এসব অ্যাকাউন্টের একটি বড় অংশ হয়তো অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এই কৌশল ‘সামাজিক স্বীকৃতি’ (Social Proof) ধারণাকে কাজে লাগায়, যেখানে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মানুষ অন্যদের আচরণ অনুসরণ করাকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বলে মনে করে। বিশেষ করে কোনো মতামত বা আচরণ নিজের সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যদের মধ্যে প্রচলিত বলে মনে হলে মানুষ তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই প্রবণতাকে কাজে লাগাতে ট্রোল নেটওয়ার্কগুলো স্থানীয় ভাষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঙ্গ ও ছবি ব্যবহার করে নিজেদের স্থানীয় নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করে। ফলে তাদের পরিচয় ও প্রচারিত বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

তথ্যবলয় (Filter Bubble) ও সামাজিক মেরুকরণ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদমের কারণে ব্যবহারকারীরা অনেক সময় নিজেদের মতের সঙ্গে মেলে এমন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিই বারবার দেখতে থাকেন। ফলে তাদের চারপাশে একধরনের তথ্যবলয় তৈরি হয়, যাকে ‘ইকো চেম্বার’ (Echo Chamber) বা ‘ফিল্টার বাবল’ (Filter Bubble) বলা হয়। এই বলয়ের মধ্যে

ভিন্নমত খুব কমই সামনে আসে; মানুষ নিজের মতের সঙ্গে মেলে এমন বক্তব্যই বেশি দেখতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে সমাজে মেরুকরণ বাড়ে এবং একপর্যায়ে মানুষ পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যা সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দেয়।

এই মেরুকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো ‘মধ্যপন্থার ক্ষয়’ (Erosion of the Middle Ground)। সমাজের একটি বড় অংশ যতদিন মধ্যপন্থী অবস্থানে থাকে, ততদিন সমাজকে দুই বিপরীত মেরুতে বিভক্ত করে কোনো আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে তোলা কঠিন। তাই এমন বিষয় বা ঘটনা সামনে আনা হয়, যা নিয়ে নিরপেক্ষ থাকা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ে এবং মানুষ কার্যত কোনো একটি পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে মধ্যপন্থী অবস্থানের পরিসর ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে; একই সঙ্গে ভিন্নমতের মানুষের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার সুযোগও ক্রমশ কমে আসে।

সাইবার সমন্বয় ও আকস্মিক গণজমায়েত (Flash Mob)

এই অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে আন্দোলন সংগঠিত করতে সবসময় আগের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না। টেলিগ্রাম বা সিগন্যালের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ ও সমন্বয় করে অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিপুলসংখ্যক মানুষ জড়ো করা সম্ভব। এতে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে পারে; ফলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে সময়মতো কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এ ধরনের যোগাযোগব্যবস্থার আরেকটি কৌশলগত সুবিধা হলো, দৃশ্যমান কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়াই আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা এই কাঠামোকে ‘নেতৃত্বহীন প্রতিরোধ’ (Leaderless Resistance) নামে অভিহিত করেন। ফলে নিরাপত্তা বাহিনী কোনো একজন নেতা বা কেন্দ্রীয় কাঠামোকে লক্ষ্য করে পুরো আন্দোলন দমন করতে পারে না। একজন সমন্বয়ককে আটক করা হলেও অন্যরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারে।

একই সঙ্গে রিয়েল-টাইম লোকেশন শেয়ারিং ও গ্রুপ চ্যাটের মাধ্যমে বিক্ষোভকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক তথ্য পেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের কার্যক্রম পরিবর্তন করতে পারে।

প্ল্যাটফর্মভিত্তিক পার্থক্য ও রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া

কালার রেভল্যুশনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। ফেসবুক ও এক্স মূলত ব্যাপক পরিসরে বার্তা প্রচার এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যবহৃত হয়, কারণ এসব প্ল্যাটফর্মের বিষয়বস্তু সহজেই সাংবাদিক ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে, টেলিগ্রাম বা সিগন্যালের মতো এনক্রিপ্টেড অ্যাপ নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি এড়িয়ে আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ইউটিউব ও টিকটকের মতো ভিডিওকেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্মে পুলিশি বলপ্রয়োগের মতো আবেগঘন ঘটনার দৃশ্য দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়, যা তাত্ক্ষণিকভাবে জনমতকে প্রভাবিত করতে পারে।

এসব কৌশল সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র সচেতন হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট বা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার সাময়িকভাবে সীমিত করা, নিজস্ব তথ্য যাচাইব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বট ও ট্রোল নেটওয়ার্ক শনাক্ত করা। তবে শুধু প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ধরনের কৌশল মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কালার রেভল্যুশনের কৌশলগুলো লক্ষ্যরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগায়; তাই প্রযুক্তিগত পদক্ষেপের পাশাপাশি এসব অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করাও জরুরি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিপফেক: তথ্য কারসাজির নতুন মাত্রা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি কালার রেভল্যুশনের কৌশলে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ২০১৫ সালে মূল বইটি প্রকাশের

সময় এসব প্রযুক্তির ব্যবহার এখনকার মতো ব্যাপক ছিল না। ‘ডিপফেক’ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন কোনো রাজনৈতিক নেতার কণ্ঠস্বর ও চেহারা নকল করে এমন ভিডিও বা অডিও তৈরি করা সম্ভব, যেখানে তাঁর মুখে সম্পূর্ণ বানোয়াট বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়। এসব ভিডিও বা অডিও এতটাই বাস্তবসম্মত হতে পারে যে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে সেগুলো আসল না নকল, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রযুক্তি কালার রেভল্যুশনে দুইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। প্রথমত, ক্ষমতাসীন সরকারকে ঘিরে বিতর্কিত বক্তব্য বা কর্মকাণ্ডের বানোয়াট অডিও বা ভিডিও প্রচার করে জনরোষ বাড়িয়ে তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, আরও উদ্বেগজনকভাবে, সত্যিকারের কোনো প্রমাণ সামনে এলেও তাকে ‘ডিপফেক’ বলে অস্বীকার করার সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞরা এই প্রবণতাকে ‘মিথ্যাবাদীর বাড়তি সুবিধা’ (Liar’s Dividend) নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ, ডিপফেক প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, বাস্তব ও কৃত্রিম তথ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা তত কঠিন হয়ে পড়ছে। এর ফলে তথ্যের সত্যতা নিয়ে মানুষের সংশয় বাড়ে এবং ধীরে ধীরে তথ্যের প্রতি সামগ্রিক আস্থা কমে যায়। এই আস্থার সংকট গণচেতনা পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। চতুর্থ অধ্যায়ে এই প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে, বৃহৎ ভাষা মডেলভিত্তিক (Large Language Model) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন লেখনশৈলীতে বিপুলসংখ্যক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে ২.২ অংশে আলোচিত ট্রোল নেটওয়ার্ক পরিচালনা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। আগে একটি ট্রোল ফার্ম পরিচালনার জন্য যেখানে শত শত মানুষের প্রয়োজন হতো, এখন প্রযুক্তির সহায়তায় তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যক মানুষ একই পরিমাণ কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন। ফলে সময় ও ব্যয়— দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে এবং বৃহৎ পরিসরে কনটেন্ট তৈরি ও প্রচার করাও অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

সমন্বিত ডিজিটাল অভিযানের প্রায়োগিক চিত্র

এই অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন কৌশল বাস্তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং একটি সমন্বিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয়। একটি সাধারণ ডিজিটাল অভিযানও সাধারণত কয়েক ধাপে অগ্রসর হয়। প্রথমে ট্রোল নেটওয়ার্ক ও বট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়- যেমন দুর্নীতির অভিযোগ- ধীরে ধীরে আলোচনায় আনা হয়। নিয়মিত প্রচারের ফলে বিষয়টি যখন স্বাভাবিকভাবে আরও বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে তা মূলধারার গণমাধ্যমে তুলে ধরা হয়। সবশেষে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে এনক্রিপ্টেড অ্যাপের মাধ্যমে রাজপথে কর্মসূচির আহ্বান জানানো ও তা সমন্বয় করা হয়।

অনলাইন প্রচারণাকে রাজপথের কর্মসূচিতে রূপান্তরের এই পুরো প্রক্রিয়ায় কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। প্রতিটি ধাপে গৃহীত পদক্ষেপের প্রভাব যাচাই করে সেই অনুযায়ী পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করা হয়। অনেকটা বাণিজ্যিক বিপণন প্রচারণার মতোই তথ্য বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করা হয়, কোন কৌশল কতটা কার্যকর হচ্ছে এবং পরবর্তী ধাপে কোথায় কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সমাজ

অস্থিতিশীলতার কেন্দ্রবিন্দু

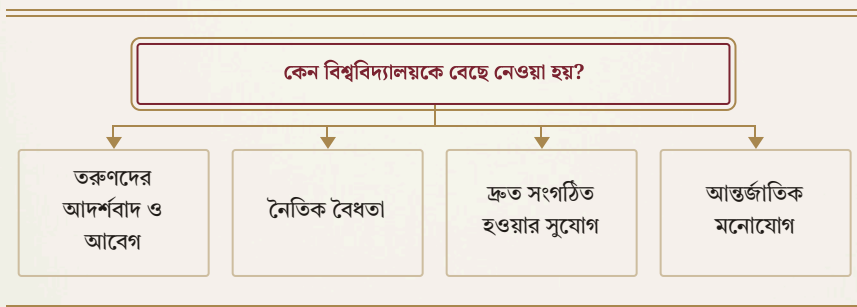
জিন শার্পের তত্ত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু করার কারণ

কালার রেভল্যুশনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচিত হন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক জিন শার্প (Gene Sharp)। তিনি বোস্টনভিত্তিক ‘অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউশন’ (The Albert Einstein Institution)-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বহুল আলোচিত গবেষণাগ্রন্থ ‘*From Dictatorship to Democracy*’-তে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের যেসব কৌশল ও প্রয়োগপদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তরুণ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।

জিন শার্প তাঁর ‘*The Methods of Nonviolent Action*’ বইয়ে অহিংস প্রতিরোধের যে ১৯৮টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তার অনেকগুলোই শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্লাস বর্জন, প্রতীকী পোশাক পরিধান, ক্যাম্পাসে সমাবেশ এবং প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বাইরে বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মতো বিভিন্ন কৌশল। শার্পের তত্ত্ব অনুযায়ী, যেকোনো শাসনব্যবস্থা জনগণের সহযোগিতার ওপর ভর করে টিকে থাকে। জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, সেই সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিলে সুসংহত শাসনব্যবস্থাও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এই কারণেই তাঁর তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাধারণত আদর্শবাদী, আবেগপ্রবণ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে সংবেদনশীল থাকে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট দাবিকে কেন্দ্র করে তাদের সক্রিয় ও সংগঠিত করে দ্রুত আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন কৌশলগত সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো।

১. নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা: রাজনৈতিক দলের আন্দোলনকে অনেক সময় ক্ষমতার লড়াইয়ের অংশ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা রাজপথে নামলে সেই আন্দোলন ‘সামাজিক সংকট নিরসনে জাতির জাগরণ’ হিসেবে দেখা হয় এবং তুলনামূলকভাবে বেশি নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

২. দ্রুত সংগঠনের সুবিধা: বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো নির্দিষ্ট দাবি বা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে একই প্ল্যাটফর্মে সংগঠিত করা সম্ভব।
৩. আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ: শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনা দ্রুত দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়। এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে সরকারের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে।
৪. বিদ্যমান নেটওয়ার্কের ব্যবহার: বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল, বিভাগ, ছাত্র সংসদ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি যোগাযোগ কাঠামো আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে। ফলে আন্দোলন সংগঠনের জন্য নতুন করে যোগাযোগব্যবস্থা তৈরি করার প্রয়োজন হয় না।



জিন শার্পের তত্ত্বের একটি শক্তিশালী দিক হলো এর ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা। তাঁর বইয়ে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোকে মূলত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: প্রতিবাদ ও প্ররোচনা (Protest and Persuasion), যার মধ্যে রয়েছে পিটিশন, প্রতীকী পোশাক ও গণসমাবেশ; অসহযোগিতা (Noncooperation), যেমন ধর্মঘট, বয়কট ও কর প্রদানে অস্বীকৃতি; এবং হস্তক্ষেপ (Intervention), যেমন সরকারি কার্যালয় দখল বা বিকল্প সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই তিন শ্রেণিতে ঝুঁকির মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কোনো পরিকল্পিত আন্দোলন সাধারণত কম ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি দিয়ে শুরু হয় এবং ধাপে ধাপে সংঘাতমূলক পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যায়।

এতে আন্দোলনকারীরা প্রতিটি ধাপে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায় এবং একই সঙ্গে সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।

আন্তর্জাতিক অনুদান, ফেলোশিপ ও ‘স্মার্ট পাওয়ার’-এর প্রভাব

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক জোসেফ নাই ‘সফট পাওয়ার’ ধারণার প্রবর্তন করেন, যেখানে সরাসরি শক্তি প্রয়োগ না করে সংস্কৃতি, শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে অন্যদের আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে হার্ড পাওয়ার ও সফট পাওয়ারের সমন্বিত ব্যবহারকে ‘স্মার্ট পাওয়ার’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই কৌশল প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

National Endowment for Democracy (NED), USAID এবং Open Society Foundations-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ফেলোশিপ, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও সম্ভাবনাময় তরুণ নেতাদের সঙ্গে কাজ করে। এসব কর্মসূচির ঘোষিত উদ্দেশ্য শিক্ষা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ। তবে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের মাধ্যম হিসেবেও দেখা হয়।

এই প্রক্রিয়া সাধারণত বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে পরিচালিত হয়। এতে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক নির্দেশনা থাকে না; বরং সম্পর্ক তৈরি, নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তারের কাজ এগিয়ে চলে। বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তথাকথিত ‘সিভিল সোসাইটি’ সংগঠনগুলোর অর্থায়ন। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র সংগঠনকে নিয়মিত অনুদান দেওয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদে এ ধরনের অর্থায়ন সংগঠনগুলোর আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সীমিত করে তাদের কার্যক্রমকে দাতা সংস্থার অগ্রাধিকারের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। তবে এসব অর্থায়ন সাধারণত আইনসম্মত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। ফলে এর মাধ্যমে ক্ষতিকর প্রভাব

বিস্তার করা হচ্ছে কি না, তা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্রের জন্য কূটনৈতিকভাবে জটিল হয়ে ওঠে।

এই অর্থায়ন-কাঠামো অনেকটা বহুস্তরীয় পিরামিডের মতো কাজ করে। সবচেয়ে ওপরের স্তরে থাকে পরাশক্তির রাষ্ট্রীয় বা আধা-রাষ্ট্রীয় দাতা সংস্থা, যারা সরাসরি দেশটির বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যুক্ত। এসব সংস্থা সাধারণত কোনো ছাত্র সংগঠনকে সরাসরি অর্থায়ন করে না; বরং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও ও থিঙ্কট্যাংককে অনুদান দেয়। মধ্যবর্তী এই সংস্থাগুলো আবার স্থানীয় পর্যায়ের ছোট বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ছাত্র সংগঠনকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়ন করে। এই বহুস্তরীয় কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এক সংগঠন থেকে অন্য সংগঠনে অর্থের প্রবাহ সহজে অনুসরণ করা যায় না। পিরামিডের প্রতিটি স্তর একে অপরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট আইনি ও কূটনৈতিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত সংগঠনও জানে না, তাদের অনুদান মূলত কোথা থেকে এসেছে। ফলে অর্থায়নের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও তা শনাক্ত করা কঠিন, কারণ অর্থের মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছাতে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক স্তর অনুসরণ করতে হয়।

লিডারশিপ, ফেলোশিপ প্রোগ্রামগুলোর কাঠামোও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এ ধরনের আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে সাধারণত নির্বাচিত তরুণ নেতাদের কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের জন্য বিদেশে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপে, নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পাশাপাশি নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং প্রভাবশালী নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারী তরুণেরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন, যা দেশে ফেরার পরও বজায় থাকে এবং সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক ও নেটওয়ার্ক তৈরির এই কৌশল স্বল্পমেয়াদি প্রচারণার তুলনায় বেশি কার্যকর। কারণ এখানে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; বরং দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে অভিন্ন রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি

গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এই তরুণেরা যখন সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, বেসরকারি সংস্থা পরিচালনা বা রাজনীতির মতো ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় আসেন, তখন তাঁদের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিকভাবেই সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে।

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কৌশল: অটপোর, খমারা, পোরা ও অন্যান্য সংগঠনের ভূমিকা

ইতিহাসের বিভিন্ন কালার রেভল্যুশন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আন্দোলন পরিচালনায় প্রায় একই আদলে গড়ে তোলা ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সংগঠনের কাঠামো, প্রশিক্ষণপদ্ধতি এবং প্রতীক ব্যবহারের ধরনে এতটাই মিল লক্ষ করা যায় যে, বিশ্লেষকেরা এগুলোকে একটি অভিন্ন সাংগঠনিক মডেলের বিভিন্ন জাতীয় সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সারণি ৩.১ বিভিন্ন দেশের কালার রেভল্যুশনে ছাত্র আন্দোলন ও প্রতীকের ব্যবহার

সংগঠন	দেশ ও সাল	আন্দোলন ও প্রতীক
Otpor (প্রতিরোধ)	সার্বিয়া (২০০০)	মিলোসেভিচবিরোধী আন্দোলন; প্রতীক: কালো মুষ্টিবদ্ধ হাত; স্লোগান: “সে শেষ”
Kmara (যথেষ্ট হয়েছে)	জর্জিয়া (২০০৩)	গোলাপ বিপ্লব; সংগঠনের প্রতীক: মুষ্টিবদ্ধ হাত; আন্দোলনের প্রতীক: গোলাপ
Pora (সময় এসেছে)	ইউক্রেন (২০০৪)	কমলা বিপ্লব; আন্দোলনের প্রতীক: কমলা রঙের ফিতা ও পতাকা

সার্বিয়ার ‘অটপোর’ (Otpor, ২০০০): প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনে অটপোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালো মুষ্টিবদ্ধ হাত ছিল সংগঠনটির প্রতীক। ১৯৯৮ সালে বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা অটপোর প্রথমদিকে ছিল একটি স্থানীয় ছাত্রভিত্তিক প্রতিবাদী সংগঠন। পরবর্তী সময়ে মার্কিন প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের সহায়তায় এটি একটি সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। পপ-কালচার, ব্যঙ্গাত্মক নাটক ও গ্রাফিতির মতো সৃজনশীল মাধ্যম ব্যবহার করে অটপোর

বিপুলসংখ্যক তরুণকে সংগঠিত করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে। এর ফলে মিলোসেভিচবিরোধী আন্দোলন আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অটপোরের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল ছিল ভয়কে হাস্যরসে রূপ দেওয়া। সরাসরি আক্রমণাত্মক স্লোগানের পরিবর্তে তারা ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার, পথনাটক ও অন্যান্য হাস্যরসাত্মক কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে বিদ্রোপ করত। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের প্রতি জনগণের ভীতি কমিয়ে আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আন্দোলনেও এই কৌশল অনুসরণ করা হয়।

জর্জিয়ার ‘খমারা’ (Kmara, ২০০৩): সার্বিয়ার অটপোর আন্দোলনের নেতাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জর্জিয়ার ছাত্র সংগঠন খমারা দেশটির ‘গোলাপ বিপ্লবে’ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ২০০৩ সালে অটপোরের সাবেক নেতারা জর্জিয়ার তরুণ আন্দোলনকর্মীদের অহিংস প্রতিরোধ, আন্দোলন সংগঠন, নির্বাচনী অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশল শেখান। এসব কৌশল কাজে লাগিয়ে খমারা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করে এবং ২০০৩ সালের নভেম্বরে সংসদ ভবন অভিমুখে আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট এদুয়ার্দ শেভার্দনাদজে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে অটপোরের সাবেক নেতারা Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies (CANVAS) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আন্দোলনকর্মীদের অহিংস প্রতিরোধের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে।

ইউক্রেনের ‘পোরা’ (Pora, ২০০৪): কিয়েভের ‘কমলা বিপ্লব’ সংগঠন ও পরিচালনায় এই ছাত্র নেটওয়ার্ক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পোরা মূলত দুই শাখায় বিভক্ত ছিল— ‘কালো পোরা’ ও ‘হলুদ পোরা’। কালো পোরা সরাসরি রাজপথের আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে, হলুদ পোরা মূলত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও ভোটার সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করত। এই দ্বৈত কাঠামোর ফলে পোরা রাজপথের আন্দোলন এবং আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া— উভয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

বেলারুশের ‘জুবর’ (Zubr, ২০০১): লুকাশেঙ্কো সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই ছাত্র সংগঠনটি অটপোরের কৌশল অনুসরণ করলেও বেলারুশে সফল হতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল বেলারুশের প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর ও সুসংহত অবস্থান। বিশ্লেষকদের কাছে এই ব্যর্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক উদাহরণ। তাঁদের মতে, একই ধরনের কৌশল অনুসরণ করা হলেও আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও নিরাপত্তা কাঠামোর সংহতি ও দৃঢ়তার ওপর।

মিশরের ‘৬ এপ্রিল যুব আন্দোলন’ (April 6 Youth Movement, ২০০৮): ফেসবুকভিত্তিক এই ছাত্র-তরুণ সংগঠনটি ২০১১ সালের আরব বসন্তের সময় মিশরে হোসনি মোবারকবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন পরিচালনায় একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। প্রচলিত ছাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভর না করে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এর ফলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুত ও বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার নতুন সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

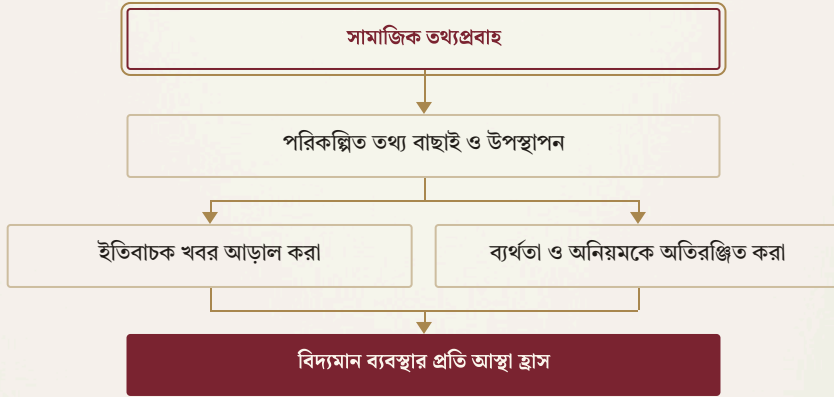
এই সংগঠনগুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে একটি অভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামো বা ‘টেমপ্লেট’ (Template) স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে আন্দোলনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য নাম এবং আকর্ষণীয় প্রতীক বেছে নেওয়া হয়। এরপর গান, গ্রাফিতি, পোশাক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারবিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী ধাপে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মূল কর্মীদের মাধ্যমে আন্দোলন বৃহত্তর ছাত্রসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সহায়তায় আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও দৃশ্যমান করে তোলা হয়। কারপোভিচ ও মানোইলোর মতে, বিভিন্ন দেশে একই ধরনের কৌশলের পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে এসব আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না; বরং একটি পরিকল্পিত কাঠামো অনুসরণ করে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। দেশভেদে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কাঠামোয় কিছু পরিবর্তন আনা হলেও মূল পদ্ধতি একই থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

জনমনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ ও আবেগের ব্যবহার

তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও গণচেতনা পরিবর্তন

মানুষের চিন্তাভাবনা অনেকাংশেই তার কাছে পৌঁছানো তথ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কালার রেভল্যুশনের কৌশলবিদরা এমন একটি তথ্য-পরিবেশ তৈরি করেন, যেখানে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো খুব কমই সামনে আসে; বিপরীতে, ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনাগুলো বারবার এবং অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়। এর ফলে জনমনে ধীরে ধীরে এমন ধারণা তৈরি হয় যে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাই গভীর সংকটে রয়েছে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার পতন ছাড়া আর কোনো কার্যকর পথ নেই।



এক্ষেত্রে ‘নেতিবাচকতার পক্ষপাত’ (Negativity Bias) নামে মানুষের একটি স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ সাধারণত ইতিবাচক তথ্যের তুলনায় নেতিবাচক তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং দীর্ঘ সময় মনে রাখে। ফলে নেতিবাচক ঘটনাগুলো বারবার সামনে আনা হলে ছোট বা বিচ্ছিন্ন ঘটনাও মানুষের কাছে বৃহত্তর ব্যবস্থাগত সংকটের অংশ বলে মনে হতে পারে। এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে জনমনে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর নেতিবাচক ধারণা তৈরি করা সম্ভব।

জনমনে আবেগ সৃষ্টির কৌশল ও চরিত্র নির্মাণ

জনমত গঠনের ক্ষেত্রে তথ্যের বাছাই ও উপস্থাপনার পাশাপাশি মানুষের আবেগকে নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১. আবেগঘন ঘটনার ব্যবহার (Outrage Manufacturing): কোনো হৃদয়বিদারক বা বিতর্কিত ঘটনাকে বারবার আলোচনায় এনে জনমনে তীব্র আবেগ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করা হয়। ছবি, ভিডিও, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা আবেগঘন বর্ণনার মাধ্যমে একই ঘটনা একাধিকবার প্রচারিত হলে জনগণের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণের চেয়ে আবেগনির্ভর প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য পেতে পারে। এভাবে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ধীরে ধীরে বৃহত্তর অন্যায় বা ব্যবস্থাগত সংকটের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে।
২. বিশেষ চরিত্র বা ‘শহীদ’ নির্মাণ: আন্দোলনে কেউ প্রাণ হারালে তার ছবি, পরিচয় ও জীবনগাঁথাকে প্রচারের কেন্দ্রে এনে তীব্র আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করা হয়। সেই ব্যক্তির মৃত্যু তখন আর কেবল একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ট্রাজেডি থাকে না; বরং বৃহত্তর অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে। এর ফলে আন্দোলনের প্রতি মানুষের আবেগ ও সহমর্মিতা বাড়ে এবং বিমিয়ে পড়া আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়।
৩. রঙ ও সংস্কৃতির ব্যবহার: নির্দিষ্ট কোনো রং, ফুল, স্লোগান কিংবা রাজপথের গানকে আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত করা হয়। এসব দৃশ্যমান ও সাংস্কৃতিক উপাদান আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি অভিন্ন পরিচয় ও সংহতির অনুভূতি তৈরি করে। এভাবে বিক্ষোভ রাজনৈতিক প্রতিবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ নেয়; সাধারণ মানুষের পক্ষেও ভয় ও সংকোচ কাটিয়ে আন্দোলনে যোগ দেওয়া সহজ হয়।
৪. সাধারণ শত্রু নির্মাণ (Common Enemy Framing): আন্দোলনের ভেতরে থাকা বিভিন্ন মতাদর্শ, শ্রেণি বা অঞ্চলের মানুষকে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে সবার প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরা হয়— সাধারণত

ক্ষমতাসীন নেতা, সরকার বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ বৃত্ত। এই প্রতিপক্ষের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলে আন্দোলনের ভেতরের আদর্শিক ও রাজনৈতিক মতভেদ সাময়িকভাবে আড়ালে চলে যায়। এর ফলে ভিন্ন মত ও স্বার্থের মানুষের অংশগ্রহণে একটি বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৫. আদর্শ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি (Utopian Promise): আন্দোলনে শুধু বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভই তৈরি করা হয় না; পরিবর্তনের পর আরও ন্যায্যভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিশ্রুতিও বারবার তুলে ধরা হয়। তবে সেই প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবে রূপ নেবে, পথে কী ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা আসতে পারে কিংবা পরিবর্তনের অন্তর্বর্তী সময়ে কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে— এসব বাস্তব প্রশ্ন তেমন আলোচিত হয় না। ফলে ভবিষ্যতের এই আকর্ষণীয় কল্পচিত্র মানুষকে তাৎক্ষণিক ঝুঁকি ও স্বল্পমেয়াদি কষ্ট মেনে নিয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করে।

প্রতীক, সাংস্কৃতিক উপাদান ও ভীতি দূরীকরণের কৌশল

আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শুধু আবেগ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এমন একটি স্বতন্ত্র পরিচয়, যার সঙ্গে মানুষ সহজে নিজেকে যুক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট রং, প্রতীক, স্লোগান ও সংগীত সেই পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক বিপণনের মতোই এসব উপাদান আন্দোলনকে এমন একটি রূপ দেয়, যা মানুষ সহজেই চিনতে ও মনে রাখতে পারে।

এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অংশগ্রহণের ভয় ও দ্বিধা কমানো। রাস্তায় নামার আগে সাধারণ মানুষের মনে গ্রেপ্তার, শারীরিক নিরাপত্তা কিংবা সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে স্বাভাবিক উদ্বেগ থাকতে পারে। তাই গান, কনসার্ট, শিল্প, উৎসব কিংবা ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মতো পরিচিত উপাদান যুক্ত করে আন্দোলনের পরিবেশকে আরও স্বতঃস্ফূর্ত ও উৎসবমুখর করে তোলা হয়। এতে আন্দোলন শুধু একটি কঠোর রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে প্রতিভাত হয় না; বরং অনেকটা সামাজিক উৎসবে রূপ নেয়। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষেও ভয় ও দ্বিধা কাটিয়ে আন্দোলনে যোগ দেওয়া সহজ হয়।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ঐতিহাসিক শিকড়

কালার রেভল্যুশনে ব্যবহৃত মনস্তাত্ত্বিক কৌশলগুলো একেবারে নতুন নয়। এসব কৌশলের অনেকগুলোর শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (Psychological Warfare) ও জনসংযোগের ইতিহাসে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনমত প্রভাবিত করতে যেসব প্রচারণা কৌশল ব্যবহৃত হতো, তার মধ্যে শত্রুকে অমানবিক হিসেবে তুলে ধরা, নিজ পক্ষের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সহজে মনে রাখার মতো স্লোগানের মাধ্যমে জটিল বাস্তবতাকে সরল করে উপস্থাপন করা ছিল অন্যতম।

কালার রেভল্যুশনের কৌশলবিদরা পুরোনো এসব পদ্ধতিকেই সময়ের সঙ্গে বদলে নিয়ে ডিজিটাল যুগে ব্যবহার করছেন। মূল নীতি একই; বদলেছে কেবল প্রচারের মাধ্যম। আগে যেখানে বেতার, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো হতো, এখন সেই কাজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অ্যালগরিদম ও তৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও দ্রুত ও ব্যাপকভাবে করা হয়। কারপোভিচ ও মানোইলো এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে কালার রেভল্যুশন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে বিকশিত প্রচারণা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কৌশলগুলোর আধুনিক প্রয়োগে গড়ে ওঠা একটি সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন।

দলগত মেরুকরণ ও জনতার মনস্তত্ত্ব: ব্যক্তি কীভাবে সমষ্টির অংশ হয়ে ওঠে

সামাজিক মনোবিজ্ঞানে ‘দলগত মেরুকরণ’ (Group Polarization) নামে একটি পরিচিত ধারণা রয়েছে। এর মূল কথা হলো, একই ধরনের মত পোষণকারী মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় করে, তখন তাদের সামষ্টিক অবস্থান আগের তুলনায় আরও তীব্র হয়ে উঠতে পারে। কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে একজন ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থান সমালোচনামূলক হলেও সংযত হতে পারে। কিন্তু তিনি যখন হাজারো সমমনা মানুষের সঙ্গে शामिल হন এবং চারপাশে নিজের মতেরই প্রতিধ্বনি শুনতে থাকেন, তখন তাঁর অবস্থানও ধীরে ধীরে আরও চরম হয়ে উঠতে পারে।

কালার রেভল্যুশনে রাজপথের বড় জমায়েতগুলোতে এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার প্রভাব দেখা যায়।

এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি ধারণা হলো ‘ব্যক্তিসত্তার বিলুপ্তি’ (Deindividuation)। বড় কোনো ভিড়ের অংশ হয়ে গেলে মানুষ অনেক সময় নিজের স্বতন্ত্র সত্তা ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার বোধ হারিয়ে গোষ্ঠীর সম্মিলিত আবেগ দ্বারা চালিত হয়। এই মানসিক অবস্থায় মানুষ এমন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণেও অংশ নিতে পারে, যা একা থাকলে হয়তো করত না।

কালার রেভল্যুশনের কৌশলে এসব মনস্তাত্ত্বিক নীতির পরিকল্পিত প্রয়োগ দেখা যায়। বড় জমায়েত, অভিন্ন রং ও প্রতীক, সমবেত স্লোগান এবং গান মানুষের মধ্যে সম্মিলিত পরিচয় ও আবেগ তৈরি করতে সাহায্য করে। হাজারো মানুষ যখন একই প্রতীক ধারণ করে, একই স্লোগান দেয় এবং একই আবেগ প্রকাশ করে, তখন তারা নিজেদের আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে না দেখে বৃহত্তর একটি গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। এর ফলে ব্যক্তিগত ভয় ও দ্বিধা কমে আসে এবং আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ও পারস্পরিক সংহতির অনুভূতি আরও দৃঢ় হয়।

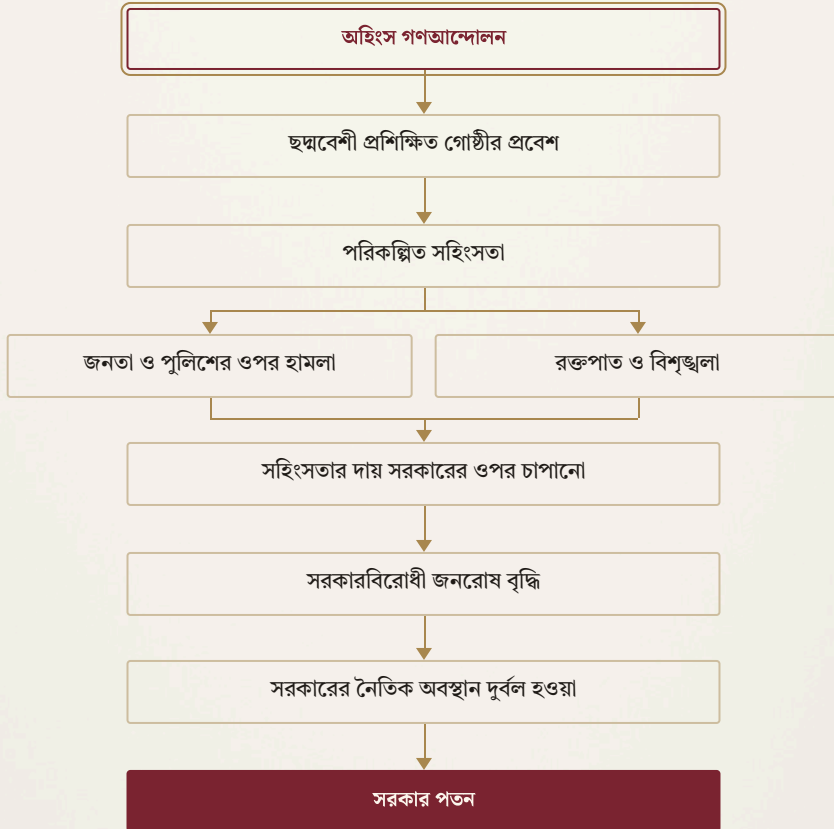
পঞ্চম অধ্যায়

গোপন অভিযান ও ছদ্মবেশী সহিংসতা

ইউক্রেনের ময়দান আন্দোলন ও স্নাইপার হামলা

অহিংস আন্দোলনের আড়ালে পেশাদার সহিংসতা

কালার রেভল্যুশনকে বাইরে থেকে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও পরিস্থিতি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠলে এর ভেতরে গোপন অভিযান (Covert Operations) পরিচালিত হতে পারে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থান নিলে আন্দোলনের ভেতরে প্রশিক্ষিত গোষ্ঠী ঢুকিয়ে পরিকল্পিত সহিংসতা সৃষ্টি করা হতে পারে। এ ধরনের ছদ্মবেশী সহিংসতার (False Flag Violence) উদ্দেশ্য হলো এর জন্য সরকারকে দায়ী করে জনমনে সরকারবিরোধী ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তোলা।



এই কৌশল কালার রেভল্যুশনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর ধাপ, কারণ এই পর্যায়েই আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে যায়। এর আগ পর্যন্ত সরকার পরিস্থিতি সামাল দিয়ে টিকে থাকতে পারলেও আন্দোলন হঠাৎ ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নিলে পুরো ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘুরে যেতে পারে। বিশেষ করে সহিংসতার নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা অস্পষ্ট থাকলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে সরকারকেই দায়ী হিসেবে তুলে ধরা সহজ হয়। কারপোভিচ ও মানোইলো তাঁদের বইয়ে ইউক্রেনের আন্দোলনকে প্রধান কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করে ছদ্মবেশী সহিংসতার এই কৌশল কীভাবে কাজ করে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইউক্রেনের রাজনৈতিক পটভূমি ও ২০০৪ সালের ‘কমলা বিপ্লব’

ইউক্রেনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস বুঝতে হলে ২০১৪ সালের ময়দান সংকটের আগের ঘটনাপ্রবাহে ফিরে তাকানো জরুরি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯১ সালে ইউক্রেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; কিন্তু তখন থেকেই দেশটি গভীর আঞ্চলিক ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমাঞ্চলে ইউরোপমুখী ও ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারার প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল; অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে রুশভাষী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল বেশি এবং রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও ছিল গভীর। এই আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাজন ইউক্রেনের নির্বাচনী রাজনীতি থেকে শুরু করে পরবর্তী রাজনৈতিক সংকটগুলোর গতিপ্রকৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আগের অধ্যায়ে আলোচিত ‘শ্যাটারবেল্ট’ ধারণার আলোকে দেখলে ইউক্রেন এই ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

২০০৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইউক্রেনের এই রাজনৈতিক বিভাজনকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে মুখোমুখি হন রাশিয়াপন্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ও পশ্চিমপন্থী ভিক্টর ইউশচেনকো। দ্বিতীয় দফার ভোটে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠলে নির্বাচন ঘিরে দেশজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক

সংকট তৈরি হয়। এই সংকট থেকেই জন্ম নেয় ‘কমলা বিপ্লব’ (Orange Revolution)। ইউশেচেকোর প্রচারণার প্রতীক কমলা রং ধারণ করে লাখ লাখ মানুষ কিয়েভের স্বাধীনতা চত্বরে (ময়দান নেজালেঝানোস্তি) সমবেত হন এবং টানা বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। এই আন্দোলনে ছাত্র ও তরুণদের সংগঠন ‘পোরা’ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত ইউক্রেনের সুপ্রিম কোর্ট দ্বিতীয় দফার ফলাফল বাতিল করে দ্বিতীয় দফার ভোট পুনরায় গ্রহণের নির্দেশ দেয়। ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সেই পুনঃভোটে ইউশেচেকো বিজয়ী হন।



কারপোভিচ ও মানোইলোর বিশ্লেষণে ২০০৪ সালের কমলা বিপ্লব ছিল আগের অধ্যায়ে বর্ণিত ছাত্রসংগঠনভিত্তিক ও প্রতীকনির্ভর কালার রেভল্যুশন মডেলের একটি অহিংস রূপ। আন্দোলনকে ঘিরে বড় ধরনের রক্তপাত ঘটেনি এবং ক্ষমতার পালাবদলও তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই আপাত সাফল্যের পরও ইউক্রেনের গভীর রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজন দূর হয়নি; বরং ক্ষমতার

পরিবর্তনের পর পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের রুশভাষী জনগোষ্ঠীর একটি অংশের মধ্যে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি আরও গভীর হয়। ছয় বছর পর, ২০১০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইয়ানুকোভিচ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন থেকে স্পষ্ট হয় যে, কমলা বিপ্লব ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজনের স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও বিভাজনের মূল কারণগুলো রয়ে গিয়েছিল। এই অমীমাংসিত বিভাজন পরবর্তী দশকের আরও গভীর রাজনৈতিক সংঘাতের পটভূমি তৈরি করে।

ইউক্রেনের ময়দান স্নাইপার হামলা ও ড. ইভান কাচানোভস্কির গবেষণা

২০১৩ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচের সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া স্থগিত করে এবং রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ নেয়। এর প্রতিবাদে কিয়েভের স্বাধীনতা চত্বরে ছাত্র ও তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা পরবর্তীতে ‘ইউরোময়দান’ আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়। শুরুতে এটি ছিল মূলত শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভ; কিন্তু সময়ের সাথে আন্দোলনের পরিধি বিস্তৃত হয়ে বৃহত্তর সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিস্থিতি রক্তাক্ত সংঘাতে গড়ায়।

ঘটনা: সংঘাতের সবচেয়ে রক্তাক্ত দিন ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি। সেদিন সকালে কিয়েভের ময়দান চত্বর ও আশপাশের এলাকায় স্নাইপারদের গুলিতে একের পর এক আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হতে থাকেন। হোটেল ইউক্রেনসহ আশপাশের বিভিন্ন ভবন থেকে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। একই সময়ে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও হতাহতের ঘটনা ঘটে।

লক্ষ্য: স্নাইপারদের গুলিতে আন্দোলনকারীদের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও হতাহত হন। এই প্রেক্ষাপটে কারা, কোথা থেকে এবং কী উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছিল, তা নিয়ে পরবর্তীতে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

ফলাফল ও রাজনৈতিক প্রভাব: জাতিসংঘের হিসাবে, শুধু ওই দিনই ৪৯ জন আন্দোলনকারী ও ৪ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিহত হন। এই রক্তপাত ইউক্রেনের রাজনৈতিক সংকটের গতিপথ দ্রুত বদলে দেয়। ইয়ানুকোভিচ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগ ওঠে এবং রক্তপাতের খবর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমবর্ধমান দেশি-বিদেশি চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কিয়েভ ত্যাগ করেন এবং পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নেন।

অধ্যাপক ইভান কাচানোভস্কির গবেষণা: কানাডার ওটাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ড. ইভান কাচানোভস্কি (Ivan Katchanovski) ময়দান হত্যাকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। ব্যালিস্টিক ও ফরেনসিক প্রতিবেদন, ঘটনাস্থলের ভিডিও ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং গুলিবর্ষণ-সংক্রান্ত রেডিও ইন্টারসেপ্টসহ বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর গবেষণা প্রকাশ করেন। গবেষণাপত্রে তিনি দাবি করেন, আন্দোলনকারীদের একটি বড় অংশের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল ময়দান আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ভবন ও এলাকা থেকে। তাঁর মতে, এই হত্যাকাণ্ড ছিল আন্দোলনকে সহিংস সংঘাতে রূপ দিয়ে ইয়ানুকোভিচ সরকারের পতনের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত একটি পরিকল্পিত ‘ফলস ক্ল্যাগ অপারেশন’।

ময়দান স্নাইপার হামলার ঘটনাপ্রবাহ ও গবেষণা

- ১ ময়দান চত্বর ও আশপাশে স্নাইপারদের গুলিতে আন্দোলনকারী ও পুলিশ সদস্যরা হতাহত হন।
- ২ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রচার করে: “ইয়ানুকোভিচ সরকার গণহত্যা চালাচ্ছে।”
- ৩ রক্তপাতের পর রাজনৈতিক সংকট দ্রুত তীব্র হয় এবং ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতা হারান।
- ৪ পরবর্তী গবেষণায় ড. কাচানোভস্কি দাবি করেন, আন্দোলনকে সহিংস রূপ দিতে আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভবন থেকে গুলি চালানো হয়েছিল।

তবে কাচানোভস্কির এই ব্যাখ্যা সর্বজনস্বীকৃত নয়; ময়দান হত্যাকাণ্ডের জন্য কারা দায়ী ছিল, তা নিয়ে গবেষক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে এখনও বিতর্ক রয়েছে। ইউক্রেন সরকার ও পশ্চিমা কিছু গণমাধ্যমও তাঁর ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছে। তা সত্ত্বেও, কালার রেভল্যুশনে ছদ্মবেশী সহিংসতার সম্ভাব্য ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প ব্যাখ্যা তুলে ধরে।

‘ব্লিডিং দ্য স্টেট’: নিরাপত্তা বাহিনীর মনোবল ভাঙার কৌশল

রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিরোধক্ষমতা ভেঙে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এই প্রক্রিয়া সাধারণত কয়েক ধাপে এগোয়:

১. মানসিক দ্বিধা সৃষ্টি: আন্দোলনকারীরা প্রথমে ফুল বা তোড়া উপহার দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আপাত সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করে। এর উদ্দেশ্য তাদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে নিরাপত্তা বাহিনীকে মানসিকভাবে দ্বিধাঘিত করা।
২. সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাপ: এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করে পরিবার ও সামাজিক পরিসরে চাপ সৃষ্টি কিংবা বয়কটের হুমকি দেওয়া হয়।
৩. উসকানি ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ: শেষ পর্যায়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে উসকানি দিয়ে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশি সহিংসতার দৃশ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করে সরকারের বৈধতা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হয়।

এই কৌশলের মূল লক্ষ্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করা। একজন পুলিশ সদস্য যখন দেখেন, তার সামনে দাঁড়ানো বিক্ষোভকারীরা তারই বয়সী তরুণ-তরুণী, তখন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তিনি দ্বিধায় পড়তে পারেন। সেই দ্বিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার আশঙ্কা যুক্ত হলে পেশাগত দায়িত্ব পালনও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপরও নিরাপত্তা বাহিনী দায়িত্ব পালনে অটল থাকলে পরিকল্পিত উসকানির মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের

দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেই সহিংসতার দৃশ্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারিত হলে সরকারের নৈতিক অবস্থান ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

২০২২-পরবর্তী যুদ্ধ ও ইউক্রেনের রাজনৈতিক বাস্তবতা: একটি কেস স্টাডির উপসংহার

ময়দান সংকট ও ইয়ানুকোভিচের পতনের পর ইউক্রেনের নতুন সরকার পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সঙ্গে, রাজনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ নেয়। একই বছর রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নিজ ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে এবং পূর্ব ইউক্রেনের দোনবাস অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও পরবর্তী আট বছরেও এর স্থায়ী সমাধান হয়নি। অবশেষে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক আগ্রাসন শুরু করে, যা এখনও চলমান।

বিশ্লেষকদের মতে, এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বের বাস্তব প্রতিফলন। ইউক্রেনের ন্যাটোভুক্তি ঠেকাতে রাশিয়া প্রয়োজনে সামরিক সংঘাতেও জড়িয়ে পড়তে পারে— সেই ভূ-রাজনৈতিক আশঙ্কাই ২০২২ সালে বাস্তবে রূপ নেয়। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো সুস্পষ্ট সমাধান হয়নি। রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের মধ্যেই লড়াই অব্যাহত রয়েছে; বেসামরিক প্রাণহানিও থামেনি। একাধিক কূটনৈতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও স্থায়ী সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেনে সামরিক জনবলের ঘাটতি ও অর্থনৈতিক সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

এই প্রলম্বিত যুদ্ধের দরুন ইউক্রেনকে চড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাশুল গুনতে হচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের অবকাঠামো এবং পশ্চিমা সামরিক ও আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ মিশনের হিসাবে, শুধু ২০২৬ সালের জুলাই মাসেই অন্তত ৪৩৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ২,৬১০ জন আহত

হয়েছেন। এ ছাড়া বাধ্যতামূলক সামরিক নিয়োগ এড়ানোর প্রবণতা ও সেনা সংগ্রহকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অসন্তোষ দেশটির ক্রমবর্ধমান যুদ্ধক্লান্তি ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইঙ্গিত দেয়।

এই দীর্ঘায়িত সংকটের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, যুদ্ধকালেও ইউক্রেনের দুর্নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা পুরোপুরি কাটেনি। আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সরকারি তহবিলের ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। ফলে ২০০৪ ও ২০১৪ সালের আন্দোলনে উচ্চারিত সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কারপোভিচ ও মানোইলোর তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে এই বাস্তবতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের মতে, কালার রেভল্যুশনে প্রতিশ্রুত সুশাসন ও জবাবদিহিতা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সব সময় বাস্তবে রূপ নেয় না; বরং পরিবর্তন-পরবর্তী অস্থিতিশীলতা মোকাবিলার অজুহাতে এসব অঙ্গীকার গৌণ হয়ে পড়ে। যুদ্ধ এই ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে দেয়; জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার তখন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবিকে আরও পেছনে ঠেলে দেয়।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন ও সহায়তার ধরনও সময়ের সঙ্গে বদলেছে। যুদ্ধের প্রথম কয়েক বছরে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে বিপুল সামরিক ও আর্থিক সহায়তা এলেও যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ধারাবাহিকতা নিয়ে বিভিন্ন দাতা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠেছে। ২০১৪ সালের ময়দান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগ; ইউরোপমুখী সেই ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। তবে এক দশকেরও বেশি সময় পর সেই আকাঙ্ক্ষা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, সে প্রশ্ন এখনো প্রাসঙ্গিক। ইউক্রেন ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের প্রার্থী হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভিন্নমতের কারণে পূর্ণ সদস্যপদ অর্জনের পথ এখনো দীর্ঘ। এই বাস্তবতাকে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত ‘আদর্শ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি’ ও তার বাস্তবায়নের মধ্যকার ব্যবধানের একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে।

২০০৪ সালের অহিংস কমলা বিপ্লব থেকে ২০১৪ সালের রক্তাক্ত ময়দান সংকট এবং ২০২২ সালে শুরু হওয়া পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ— এই দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহ একটি সফল কালার রেভল্যুশনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়। এ কারণেই ইউক্রেনকে এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত কেস স্টাডি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রুশ লেখকদ্বয়ের তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে এই ঘটনাপ্রবাহে একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। প্রথমে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজনের পটভূমিতে ছাত্র ও তরুণসমাজকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। প্রথম দফায় সেই আন্দোলন সফল হোক বা না হোক, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন অমীমাংসিত থেকে গেলে সময়ের সঙ্গে তা আরও গভীর হয়ে সহিংস রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে পারে— যেমন ২০১৪ সালে দেখা যায়। এরপর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে দেশটির নতুন অবস্থান যদি কোনো পরাশক্তির নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, তবে সেই সংকট আরও গভীর হয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ণমাত্রার সামরিক সংঘাতে রূপ নিতে পারে। ইউক্রেনের ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে চরম পরিণতি দেখা যায় ২০২২ সালে।

কারপোভিচ ও মানোইলোর মতে, ইউক্রেনের দীর্ঘ রাজনৈতিক পথপরিক্রমা অন্যান্য রাষ্ট্রের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে— বিশেষ করে যেসব দেশে গভীর আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাজন রয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বিরাজ করছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি কেবল ক্ষমতার পালাবদলেই সীমিত থাকে এবং সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে সেই অসন্তোষ ভবিষ্যতে আরও বড় সংকটের জন্ম দিতে পারে। ইউক্রেনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষাই পরবর্তী অধ্যায়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রস্তাবিত সুরক্ষাকৌশলের ভিত রচনা করে।

কালার রেভল্যুশন-পরবর্তী অস্থিরতা: ঐতিহ্য ধ্বংস ও সংখ্যালঘু নিপীড়নের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ইউক্রেন ও আরব বসন্তসহ বিভিন্ন কালার রেভল্যুশনের ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে ক্ষমতার পালাবদলের অব্যবহিত পর একটি পুনরাবৃত্তিক প্রবণতা লক্ষ করা

যায়। কারপোভিচ ও মানোইলোর মতে, এটি কালার রেভল্যুশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ প্রায়ই উপেক্ষিত দিক। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ক্ষমতার আকস্মিক পরিবর্তনে সাময়িক যে ‘অরাজকতার অবকাশ’ (Chaos Window) তৈরি হয়, সেই সুযোগে পুরোনো সরকারের আমলে নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন উগ্রপন্থী ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী নিজেদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অথচ এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মূল আন্দোলনের ঘোষিত দাবির কোনো সরাসরি সম্পর্ক থাকে না।

ইউক্রেন: নিজস্ব ইতিহাসের প্রতীক ধ্বংস ও রুশভাষী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতা

২০১৩ সালের ৮ ডিসেম্বর, ময়দান আন্দোলন শুরুর কিছুদিন পর, কিয়েভে ব্লাদিমির লেনিনের একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ‘লেনিনোপাদ’ (Leninopad), অর্থাৎ ‘লেনিন-পতন’ নামে পরিচিতি পায়। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতালাভের সময় ইউক্রেনে লেনিনের প্রায় ৫,৫০০টি ভাস্কর্য ছিল, যার বড় অংশ পরবর্তী দুই দশকে অপসারণ করা হয়। শুধু ২০১৪-১৫ সালেই আরও সাত শতাধিক ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা বা অপসারণ করা হয়। এরপর ২০১৫ সালের ‘ডিকমিউনাইজেশন’ আইনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট প্রতীক অপসারণের অজুহাতে অবশিষ্ট ভাস্কর্যগুলোর অপসারণও বাধ্যতামূলক করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এসব ভাস্কর্য ছিল ইউক্রেনের সোভিয়েত যুগের ইতিহাসের অংশ, অর্থাৎ জাতির নিজস্ব অতীতের একটি অধ্যায়। অথচ নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ‘নিপীড়নমূলক শাসনের প্রতীক অপসারণের’ যুক্তিতে সেই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে জনপরিসর থেকে মুছে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এভাবে জাতীয় ইতিহাস ও পরিচয় পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় নিজেদের অতীতের একটি অধ্যায়কেই প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অন্যদিকে, ময়দান-পরবর্তী সরকারের ভাষানীতি, বিশেষত ২০১৭ সালের শিক্ষা আইন ও ২০১৯ সালের রাষ্ট্রভাষা আইন, শিক্ষা ও গণমাধ্যমে রুশ ভাষার ব্যবহার সীমিত করে। এসব পদক্ষেপ পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের রুশভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি ও ভাষাগত অধিকার নিয়ে উদ্বেগ আরও গভীর করে তোলে। ইউরোপ কাউন্সিলের ভেনিস কমিশনও ইউক্রেনীয় ভাষার প্রসারের বৈধতা

স্বীকার করার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের ভাষাগত অধিকার সুরক্ষায় ঘাটতির সমালোচনা করে। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, আগে থেকেই বিদ্যমান ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিভাজন দোনবাস সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি তৈরি করেছিল। পরবর্তী সময়ে গৃহীত ভাষানীতিগুলো সেই বিভাজন আরও গভীর করে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে জটিল করে তোলে। তবে সংঘাতের পেছনে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপসহ অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসব কারণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

আরব বসন্ত: সুফি মাজার ধ্বংস ও জ্ঞানভাণ্ডার পুড়িয়ে দেওয়া

২০১১ সালের আরব বসন্তের পর তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতেও একই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যায়। তবে সেখানে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজেরই একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ধারা— সুফিবাদ। তিউনিসিয়ায় প্রেসিডেন্ট বেন আলীর পতনের পর ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে উগ্র সালাফিপন্থী গোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্তত ৪০টি সুফি মাজার ও দরগাহ পুড়িয়ে দেয় বা ভেঙে ফেলে। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সিদি বু সাইদের মাজারও ছিল।

লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার সুযোগে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো ঐতিহাসিক সুফি স্থাপনাগুলোর ওপর হামলা চালায়। ত্রিপোলি, বেনগাজি ও জলিতানসহ বিভিন্ন শহরে বুলডোজার ও বিস্ফোরক ব্যবহার করে বহু মাজার ও মসজিদ ধ্বংস করা হয়। ২০১২ সালের আগস্টে জলিতানে সুফি সাধক আবদুস সালাম আল-আসমারের মাজার ও মসজিদে হামলার সময় শতাব্দীপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে ধর্মীয় স্থাপনার পাশাপাশি লিবিয়ার সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যও ধ্বংসের শিকার হয়।

চারটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে একটি অভিন্ন কাঠামোগত ব্যাখ্যা উঠে আসে, যা কারপোভিচ ও মানোইলোর তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো ক্ষেত্রেই মূল আন্দোলনের ঘোষিত কর্মসূচি থেকে এমন ধ্বংসযজ্ঞের পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবরই এসব ধ্বংসযজ্ঞকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বা

‘উসকানিদাতাদের কাজ’ বলে দায় এড়িয়েছে। কিয়েভে লেনিনের ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনায় ময়দান নেতৃত্বের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতেও একই প্রবণতা দেখা যায়।

সারণি ৫.১ কালার রেভল্যুশন-পরবর্তী নৈরাজ্যের তুলনামূলক চিত্র

দেশ	ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা ও নিদর্শন	ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহ্য ও জনগোষ্ঠী
ইউক্রেন (২০১৪-পরবর্তী)	সোভিয়েত যুগের স্মৃতিস্তম্ভ (৭০০টির বেশি লেনিনের ভাস্কর্য)	নিজস্ব ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও রুশভাবী জনগোষ্ঠী
তিউনিসিয়া (২০১১-২০১৩)	অন্তত ৪০টি সুফি মাজার ও দরগাহ	সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের ভিন্নধারার অনুসারী (সুফি সম্প্রদায়)
লিবিয়া (২০১১-পরবর্তী)	সুফি মসজিদ, মাজার ও পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার	সংখ্যাগুরু ধর্মের ভিন্নধারার অনুসারী সুফি সম্প্রদায় ও সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য
মিশর (২০১১)	ইনস্টিটিউট দ্য এজিপ্ত ও এর দুর্লভ গ্রন্থ-পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ	জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার ও ঐতিহাসিক দলিল

তবে কাঠামোগত বিশ্লেষণে এসব ঘটনার পেছনে তিনটি সাধারণ কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, ক্ষমতার আকস্মিক পরিবর্তনে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, যার সুযোগ নেয় দীর্ঘদিন ধরে কোণঠাসা হয়ে থাকা উগ্রপন্থী ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীগুলো। দ্বিতীয়ত, নিজেদের বৈধতা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় নতুন অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। কারণ এতে পুরোনো ‘দমনমূলক’ শাসনের পুনরাবৃত্তির অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থাকে। তৃতীয়ত, ‘বিপ্লবী উন্মাদনার’ পরিবেশে আন্দোলনকারীদের একাংশ অতীতের প্রতীক ও ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীগুলোকে ‘পুরোনো ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে ন্যায্য বলে মনে করতে পারে।

এই প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকার গুরুত্বও লেখকদ্বয় বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, কালার রেভল্যুশনের ক্ষতি কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং একটি জাতির নিজস্ব ইতিহাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বহুত্ব এবং জ্ঞান-ঐতিহ্যের ওপরও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কখনো কখনো কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে। তাই ক্ষমতার আকস্মিক পরিবর্তনের পর এ ধরনের প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং তা

প্রতিরোধে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জাতির দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

কিরগিজস্তান: টিউলিপ বিপ্লব ও দ্বিতীয় দফার রক্তপাত

ইউক্রেনের পাশাপাশি কিরগিজস্তানের অভিজ্ঞতাও কালার রেভল্যুশনের কৌশল ও পরিকল্পনা বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশটিতে একই কাঠামো দুই দফায় প্রয়োগ করা হলেও কোনো ক্ষেত্রেই কালার রেভল্যুশনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

২০০৫ সালের মার্চে সংসদীয় নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগে প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা ‘টিউলিপ বিপ্লব’ নামে পরিচিতি পায়। জর্জিয়া বা ইউক্রেনের মতো শক্তিশালী ছাত্রসংগঠন কিংবা সুসংগঠিত নাগরিক সমাজ কিরগিজস্তানে ছিল না। আন্দোলন মূলত রাজধানী বিশকেক ও দক্ষিণাঞ্চলের ওশ শহরে স্থানীয় প্রভাবশালীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে, যাদের অনেকেই ক্ষমতার অংশীদার হতে চাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত আকায়েভ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং কুরমানবেক বাকিয়েভ ক্ষমতায় আসেন।

কিন্তু বাকিয়েভের শাসনামলে প্রমাণিত হয়, নেতৃত্বের পরিবর্তন মানেই শাসনব্যবস্থার চরিত্রের পরিবর্তন নয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বাকিয়েভ পরিবার স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকে আকায়েভের আমলের চেয়েও ব্যাপকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। ২০১০ সালের এপ্রিলে অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে দ্বিতীয় দফায় গণবিক্ষোভ শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৮৭ জন নিহত হন। শেষ পর্যন্ত বাকিয়েভও দেশত্যাগে বাধ্য হন।

দ্বিতীয় বিপ্লবের কিছুদিন পরই দক্ষিণ কিরগিজস্তানের ওশ শহরে জাতিগত কিরগিজ ও উজবেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের হিসাবে, চার শতাধিক মানুষ নিহত এবং প্রায় চার লাখ মানুষ বাস্তব্য়ত হন, যাদের বড় অংশই ছিলেন উজবেক সংখ্যালঘু। এই ঘটনা পূর্বে আলোচিত ‘অরাজকতার অবকাশ’ (Chaos Window)-এ সংখ্যালঘু নিপীড়নের প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় দীর্ঘদিনের জাতিগত উত্তেজনা সহিংস রূপ নেয়।

কিরগিজস্তানের দুই দফার অভিজ্ঞতা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়—
বহিঃশক্তির কৌশল যত সুপরিকল্পিতভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, লক্ষ্যরাষ্ট্রে
সুসংগঠিত ও জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক বিকল্প না থাকলে ক্ষমতার পালাবদল
কেবল এক স্বেরাচারীকে সরিয়ে আরেক স্বেরাচারীকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অভিজ্ঞতা
বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপস্থাপিত তুলনামূলক বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের
সার্বভৌমত্ব রক্ষার কৌশল

কালার রেভল্যুশনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও পরিণতি

কালার রেভল্যুশনের মাধ্যমে সফলভাবে সরকার পরিবর্তন ঘটলেও সংশ্লিষ্ট অনেক দেশই পরবর্তী সময়ে দীর্ঘমেয়াদি সংকটে পড়েছে। ইউক্রেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সংঘাতের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। একইভাবে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে।

এই দীর্ঘমেয়াদি পরিণতির একটি কাঠামোগত ব্যাখ্যা রয়েছে। কালার রেভল্যুশনের কৌশল সাধারণত নির্দিষ্ট শাসককে অপসারণে কার্যকর হলেও টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা এতে থাকে না। আন্দোলন যত দ্রুত ও আবেগনির্ভরভাবে সংগঠিত হয়, ক্ষমতার পালাবদলের পর তত দ্রুতই সেই ঐক্য বিলীন হয়ে যায়। কারণ আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি থাকে অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কোনো ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা নয়। ফলে পুরোনো শাসকের পতনের পর ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হয়, যা প্রায়ই নতুন রাজনৈতিক বিভাজন, প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়।

ক্ষুদ্র ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কৌশল

১. সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ: দেশের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভই কালার রেভল্যুশনের প্রধান অনুঘটক। দেশে সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকলে বাইরের কোনো শক্তির পক্ষে সহজে জনঅসন্তোষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন নিয়মিত ও স্বাধীন বিচারবিভাগীয় নিরীক্ষা, সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব প্রকাশ এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যেসব দেশে দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেখানে জনগণের অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রাতিষ্ঠানিক পথেই নিরসনের সুযোগ তৈরি হয়। ফলে রাজপথে চূড়ান্ত সংঘাতের প্রয়োজনীয়তা ও আশঙ্কা উভয়ই কমে আসে।

২. বৈদেশিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা: দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদানসহ অন্যান্য বৈদেশিক অর্থের উৎস ও উদ্দেশ্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এ জন্য বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বচ্ছ নিবন্ধন ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে অর্থায়নের প্রকৃত উৎস ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংযোগ সম্পর্কে জনগণ অবগত থাকতে পারে। তবে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ যেন স্বাধীন নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের কর্তরোধের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে, সে বিষয়েও সমান সতর্কতা জরুরি। অতিরিক্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ নিজেই নতুন করে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের জন্ম দিতে পারে।
৩. তথ্য নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সচেতনতা: বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রচার ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ মোকাবিলায় নাগরিকদের ডিজিটাল সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। এ জন্য শিক্ষাক্রমে গণমাধ্যম সাক্ষরতা (Media Literacy) অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই তথ্যের উৎস যাচাই, ডিপফেক শনাক্তকরণ ও আবেগনির্ভর প্রচারণা চিহ্নিত করতে শেখানো প্রয়োজন। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তথ্য যাচাইকারী (Fact-Checking) প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত শনাক্ত করা যায়।
৪. যুবসমাজকে মূলধারায় সম্পৃক্ত রাখা: তরুণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কর্মসংস্থানের বাস্তবসম্মত সুযোগ সৃষ্টি করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তরুণদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপ তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্রসংগঠনগুলোর মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে কালার রেভল্যুশনের আন্দোলনে যুক্ত করার কৌশল প্রতিহত করতে সহায়ক হতে পারে।
৫. আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন নিরসন: জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ছাড়া কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। ইউক্রেনের

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন রাজনৈতিকভাবে নিরসন করা না হলে তা বারবার সংকটের জন্ম দিতে পারে, এমনকি আগের চেয়েও তীব্র রূপ নিতে পারে। এ জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিক কাঠামো এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণ— এই তিনটি বিষয়কে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পেশাদারিত্ব: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তা বাহিনী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও পেশাদার থাকলে বহিঃশক্তির পক্ষে তাদের আনুগত্য ও মনোবল দুর্বল করা কঠিন। বেলারুশ ও জর্জিয়ার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের জন্য উপযুক্ত বেতনকাঠামো, পেশাগত মর্যাদা ও সুস্পষ্ট আচরণবিধি নিশ্চিত করা তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৭. অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা: বৈদেশিক ঋণ ও নির্দিষ্ট কোনো শক্তিবলয়ের ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক নির্ভরতা ভূ-রাজনৈতিক চাপের মুখে একটি রাষ্ট্রের অবস্থানকে আরও নাজুক করে তোলে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বহুমুখী করা, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করার মাধ্যমে বহিঃশক্তির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে রাষ্ট্রের কৌশলগত স্বাধীনতা সুদৃঢ় করা সম্ভব।

সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কারপোভিচ ও মানোইলো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কালার রেভল্যুশন কোনো অলৌকিক বা অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি সুনির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্তিযোগ্য কৌশল, যার প্রতিটি ধাপ চিহ্নিত করা ও বোঝা সম্ভব। যে রাষ্ট্র সময়মতো নিজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা— দুর্নীতি, বৈষম্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ও যুবসমাজের বিচ্ছিন্নতা— চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনে উদ্যোগী হয়, সেই রাষ্ট্রই বহিঃশক্তির প্রভাব ও অভ্যন্তরীণ চাপের সমন্বিত কৌশল মোকাবিলা করে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: সাফল্য, ব্যর্থতা ও পরিণতি

এই বইয়ে আলোচিত বিভিন্ন কালার রেভল্যুশনের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে বিপ্লবের ফলাফলের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির নিবিড় সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারণি ৬.১ কালার রেভল্যুশনের তুলনামূলক ফলাফল ও দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি

দেশ/আন্দোলন	ফলাফল	সহিংসতার মাত্রা	দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি
সার্বিয়া (২০০০)	সফল	সীমিত	রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস
জর্জিয়া (২০০৩)	সফল	সীমিত	ন্যাটোমুখী পররাষ্ট্রনীতি
ইউক্রেন (২০০৪)	আংশিক সফল	সীমিত	রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক বিভাজন অব্যাহত
কিরগিজস্তান (২০০৫)	স্বল্পমেয়াদে সফল	সীমিত (২০০৫), উচ্চ (২০১০)	দ্বিতীয় দফায় রক্তাক্ত অভ্যুত্থান
ইউক্রেন (২০১৪)	স্বল্পমেয়াদে সফল	উচ্চ (স্নাইপার হামলা)	দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ
বেলারুশ (জুবর)	ব্যর্থ	সীমিত	শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত
রাশিয়া (ছোয়াইট রিবন)	ব্যর্থ	সীমিত	শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত
হংকং (আন্দোলন)	ব্যর্থ	মাঝারি	রাজনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত
সিরিয়া	দীর্ঘমেয়াদে সফল (সরকার পরিবর্তন)	অত্যন্ত উচ্চ	দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

এই তুলনামূলক সারণি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেসব দেশে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সংহত ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছিল (বেলারুশ, রাশিয়া), সেখানে আন্দোলন কালার রেভল্যুশনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে, যেসব দেশে আগে থেকেই গভীর আঞ্চলিক বা সাংস্কৃতিক বিভাজন ছিল এবং রাষ্ট্রযন্ত্র দুর্বল বা বিভক্ত ছিল (ইউক্রেন, সিরিয়া), সেখানে কালার রেভল্যুশনের

মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দীর্ঘমেয়াদে আরও গভীর সংকট ও সহিংসতার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, কোনো দেশে কালার রেভল্যুশনের সাফল্য বা ব্যর্থতা বহিঃশক্তির কৌশলগত দক্ষতার চেয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংহতি ও স্থিতিস্থাপকতার ওপর বেশি নির্ভর করে।

এই তালিকায় কিরগিজস্তানের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে দেশটিতে একই প্রবণতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিংকন মিচেলের *The Color Revolutions* (2012) গ্রন্থে উদ্ধৃত ফ্রিডম হাউসের সূচক অনুযায়ী, ২০০৫ সালের টিউলিপ বিপ্লবের পর কিরগিজস্তানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সামান্য উন্নতি ঘটলেও ২০১০ সাল নাগাদ তা আকায়েভের শাসনামলের সমপর্যায় বা আরও খারাপ অবস্থায় ফিরে যায়। জর্জিয়া ও ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও একই সূচকে অনুরূপ অবনতি দেখা যায়— জর্জিয়ায় ২০০৭ সালের সরকারি দমননীতির পর এবং ইউক্রেনে দীর্ঘস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে। এসব তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমা মদদপুষ্ট সরকার পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুত টেকসই গণতান্ত্রিক উত্তরণ নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং সরকার পরিবর্তনের ফলে কেবল এক ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর জায়গায় আরেক গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু শাসনব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এই অভিজ্ঞতা বইটির মূল সতর্কবার্তাকেই জোরালোভাবে সমর্থন করে।

কালার রেভল্যুশন: সতর্কবার্তা, অনিবার্য পরিণতি নয়

কালার রেভল্যুশন তত্ত্ব কোনো নিয়তিবাদী (Deterministic) কাঠামো নয়। কোনো আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, সামাজিক মাধ্যমে সরকারবিরোধী প্রচারণা কিংবা বৈদেশিক অনুদানপুষ্ট বেসরকারি সংস্থার উপস্থিতি থাকলেই তাকে পরিকল্পিত বহিঃস্থ ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। বাস্তবে বিশ্বের অধিকাংশ ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক সমাজের কার্যক্রম স্থানীয় বাস্তবতা ও অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে। কারপোভিচ ও মানোইলোর তাত্ত্বিক কাঠামোর গুরুত্ব এখানেই যে, এর মাধ্যমে কোনো আন্দোলনের গঠন, অর্থায়ন ও কৌশলগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

সম্ভব। তবে এই কাঠামোর ভিত্তিতে প্রতিটি জনআন্দোলনকে নির্বিচারে ‘বিদেশি ষড়যন্ত্র’ বলে খারিজ করে দেওয়াও সমান বিপজ্জনক, কারণ এতে প্রকৃত অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও জনগণের যৌক্তিক দাবি উপেক্ষিত থেকে যেতে পারে।

এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো, কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বহিঃশক্তির হুমকি শনাক্ত করার চেয়ে অভ্যন্তরীণ ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে। একটি সুশাসিত, ঐক্যবদ্ধ ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিস্থাপক রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হ্রাস পায়, ফলে বহিঃশক্তির প্রভাব বিস্তারের সুযোগও সীমিত হয়ে আসে। আর এটাই কালার রেভল্যুশনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর ও টেকসই প্রতিরক্ষা।

ଗ୍ରନ୍ଥପଞ୍ଜି

1. Karpovich, Oleg & Manoilo, Andrei. (2015). *Color Revolutions: Techniques in Breaking Down Modern Political Regimes*. Bloomington, IN: AuthorHouse.
2. Sharp, Gene. (1993). *From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation*. Boston: The Albert Einstein Institution.
3. Katchanovski, Ivan. (2015). *The "Snipers' Massacre" on the Maidan in Ukraine*. School of Political Studies, University of Ottawa.
4. Mackinder, Halford J. (1904). *The Geographical Pivot of History*. The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4.
5. Nye, Joseph S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
6. Britannica. (2026). *12-Day War (June 2025): Israel-Iran-United States Conflict*. Encyclopaedia Britannica, updated August 2026.
7. Al Jazeera. (2026). *US, Israel Bomb Iran: A Timeline of Talks and Threats Leading Up to Attacks*.
8. Russia Matters. (2026). *The Russia-Ukraine War Report Card*, August 2026 issue.
9. Wikipedia contributors. (2026). *Timeline of the Russo-Ukrainian War (1 June 2022 – present)*.
10. Wikipedia contributors. (2025). *Demolition of Monuments to Vladimir Lenin in Ukraine*.

11. The Christian Century / Christian Science Monitor. (2018). *How Tunisia's Sufis Have Withstood Attack by Hard-line Islamists*.
12. Carnegie Endowment for International Peace. (2018). *The Sufi-Salafi Rift*.
13. History Today / France 24. (2011-2012). *The Fire at the Institut d'Égypte, Cairo: Coverage of the December 2011 Burning*.
14. Mitchell, Lincoln A. (2012). *The Color Revolutions*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

